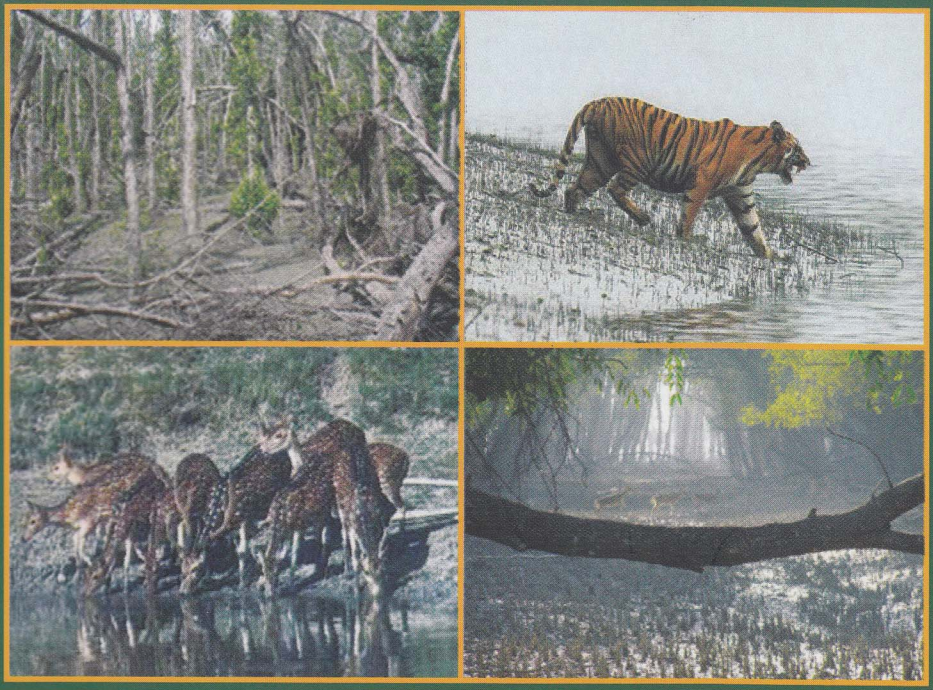
ENVIRONMENT & OUR BIO-DIVERSITY

[পরিবেশ ও আমাদের জীববৈচিত্র্য]



NORTHERN UNIVERSITY
BANGLADESH

NORTHERN UNIVERSITY

B A N G L A D E S H

Environment and Our Bio-diversity
[পরিবেশ ও আমাদের জীববৈচিত্র্য]

Editor

Dr. Mohammad Ekramol Islam

Northern University Environmental Club
Northern University Bangladesh

Environment and our Biodiversity
[পরিবেশ ও আমাদের জীববৈচিত্র্য]
First Edition: June 5, 2010

Printed By:
The Amo Printers
Arambag, Dhaka, Phone:7192593, Mob.01819292965

Published by:
Northern University Environmental Club

Chief Advisor
Professor. Dr. M. Shamsul Haque

Advisors
Prof. M.A. Razzaque
Professor Dr. Abdul Awal Khan
Prof. Mustafa Kamal
Prof. Dr. Sheikh Ashraf Ali
Prof. Dr. Mahmudul Alam
Prof. Dr. Kazi Ahmed Nabi
M. Abu Bakar Siddique
Md. Lutfor Rahman
Mr. Borhan Uddin
Ms. Ayesha Akhter

Editor
Dr. Mohammad Ekramol Islam

Members
Mr. Md. Shoriful Islam
Mr. Mohammad Masum Billah
Ms. Nazma Akter
Ms. Afia Akter
Md. Abdullah Mahfuz

Co-operation
Mr. Md. Faizullah Kawshik
Mr. Md. Alomgir Hossain
Mr. Md. Rafkat Ali
Mr. Md. Shafiul Alam Chowdhury

সম্পাদকীয়

গত শতাব্দীতে মানুষ যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন, বিজ্ঞানের জয়গানের তালে হারিয়ে গিয়েছেন। তাদের অবশ্যই এটাও মনে রাখতে হবে উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার সমন্বয় না হলে সেটা হবে পৃথিবীর জন্য, পৃথিবী বাসীর জন্য অত্যন্ত ভয়ানক। বিপন্ন পরিবেশে জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি সাধন হয়ে থাকে। যার সাথে মানুষের জীবন-জীবিকারও রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। পৃথিবীর প্রায় ১১০ কোটি গরীব মানুষ তাদের ৯০% চাহিদা যেমন - খাদ্য, জ্বালানী, ঔষধ, আসবাব-পত্র, বাসস্থানের সরঞ্জাম ও যানবাহনের ব্যবস্থা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই মেটায়। সম্প্রতি প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশ, বিশ্বে ৩০০ কোটি মানুষ সমুদ্র ও উপকূলীয় প্রাণী বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি সরাসরি মাছ ধরার কাজে জড়িত। এভাবে প্রত্যেকটি মানুষই তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশ ও তার মধ্যে বসবাসরত প্রাণীজগতের উপর নির্ভশীল। এই নির্ভরতা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও জটিল। এই নির্ভরতা বুঝার জন্য ব্যপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কোন কারণে এই নির্ভরতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে গেলেই বা ব্যত্যয় ঘটলেই দেখা দেয় জলবায়ুর পরিবর্তন, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি। কাজেই পরিবেশ রক্ষায়–আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে জীববৈচিত্র্যের বিষয়টি যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে প্রাণবৈচিত্র্য সনদ (Conventional on Biological Diversity) গৃহীত হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য প্রতিবছর প্রাণীবৈচিত্র্য সনদ নিয়ে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর বেশ নাচন-কোদন হলেও কার্যকরী পদক্ষেপ তেমন কিছুই নেওয়া হয়নি যা বেশ কিছু পরিসংখ্যানে চোখ বুলানেই বুঝা যাবে। এক পরিসংখ্যান মতে গত ১০ বছরে শুধু জমিতেই প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ক্ষতি হয়েছে পায় ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশী। প্রকৃত হিসাবে ক্ষতির পরিমান বের করা আমার দৃষ্টিতে অসম্ভব। কারণ পরিবেশ ধ্বংসের কুফল সময় দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

জীববৈচিত্র্য রক্ষা এখন সময়ের দাবী। জীববৈচিত্র্য রক্ষার জোর দাবী নিয়ে এবার সারা বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১০। যার প্রতিপাদ্য বিষয় "জীববৈচিত্র্যপূর্ণ একটি পৃথিবীই আমাদের স্বপ্ন (Many species. One planet. One future)"। নর্দান ইউনিভার্সিটি এনভাইরনমেন্টাল ক্লাবও প্রতিবছর দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকে। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হলেও বুক ভরা আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বইটি। যারা বইটিতে মূল্যবান, চিন্তাশীল ও সময়পোযোগী লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের লেখা পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। বরাবরের মত বইটি দুইটি অংশে বিভক্ত থাকবে। প্রথম অংশে বাংলা ও দ্বিতীয় অংশে ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধগুলোর সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বইটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে নর্দান ইউনিভার্সিটি এনভাইরনমেন্টাল ক্লাবের পরিচালনা কমিটির সদস্যের অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ভাবে বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের কাছে। যাদের আর্থিকসহ সার্বিক সাহায্য ব্যতীত বইটি কোনভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। কতৃপক্ষের উৎসাহ উদ্দিপনা অবশ্যই প্রসংশার দাবী রাখে।

বইটি পাঠকের জন্য চিন্তার খোরাক ও সচেতনতা তৈরীর সহায়ক হবে বলেই আমার ধারনা। বইটিতে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের অবগত করলে পরবর্তীতে শুদ্ধ করার প্রয়াস থাকবে এবং পাঠকবৃন্দ ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই কামনায়।

ড. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম
৫ জুন, ২০১০

CONTENTS

SI No.	Titel & Author	Page No.
	Part - I	
১.	পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্য *-সাহিদা বেগম*	১-৬
২.	জলবায়ু পরিবর্তনের পরিনাম *-মুহাম্মদ ইব্রাহীম*	৭-১০
৩.	জীববৈচিত্র্যে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবঃ প্রেক্ষাপট কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত *-আমিনা আক্তার*	১১-১৪
৪.	পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের অবদান *-ড. মোঃ মোহসীন উদ্দিন*	১৫-১৯
৫.	পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন *-খাজা ওয়ালিউল্লাহ*	২০-২৩
৬.	জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঃ আজকের ভাবনা ও করণীয় *ড. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম*	২৪-৩২
৭.	শান্তি -ম. মীজানুর রহমান	৩৩
৮.	গাছ *ইসমাইল সৈয়দ জনী*	৩৪
৯.	জেগে উঠুক বাংলাদেশ *- মোঃ শফিকুর রহমান*	৩৫

Part - II

10. Giving Fundamental Rights to Natural Phenomenon 39-40
-Prof. Dr. M. Shamsul Haque

11. Environmental change and Biodiversity in Bangladesh 41-42
-Motiur Rahman

12. Lake's Water Quality of Dhaka City: Alarm for Environment
-Md. Rezaul Rakib 43-48

13. Cyclone Aila and it's Impacts on Bangladesh 49-53
-Md. Shajahan Hossain

14. Urban Forestry & City dwellers: Ensuring quality of life & Environment
- Khalid Md. Bahauddin 54-55

15. Pollution Effects on Birds 56-57
Md. Moinuddin Ahmed

16. Healthy Environment Healthy Bangladesh 58-62
-Dr. A S M Atiqur Rahman

17. Industrialization and Biodiversity Concern of Bangladesh
-Md. Mohiuddin 63-64

Part : I

[প্রথম পর্ব]

পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্য

-সাহিদা বেগম *

পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্যকে নিয়ে চারদিকে চলছে নানা আয়োজন, নানা পরিকল্পনা। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হচ্ছে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন, রেডিও, টিভি চ্যানেলের পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠানমালা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন, ব্যানার, ফেস্টুন, গ্রাফিটির মাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশ। সব যেন সুন্দর নির্মল পরিবেশ সৃষ্টির এক একটি প্রয়াস। অন্যদিকে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আলাদাভাবে পরিবেশ বিজ্ঞান চালুকরণ টেকসই পরিবেশ প্রণিধানের একটি শুভ লক্ষণ। বাড়ির প্রতিটি সদস্যর উচিত পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা সর্ম্পকে সবাইকে সচেতন করে গড়ে তোলা, কেননা বাড়ির চার দেয়ালের ভেতর থেকেই যে কোন ভালো কাজের সূচনা হয়। নিজের কিছু ছোট ছোট ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমই পরিবেশকে বাচাঁনো যায় বিপর্যয়ের হাত থেকে। সবাই মিলে কিছু ভালো অভ্যাস পরিবেশকে আনতে পারে একটি সুন্দর পরিবর্তন। অনেকের দিকে না তাকিয়ে ভালো কাজের চর্চা শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকেই। পরিবেশটাকে সুন্দর করে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার এই অংশগ্রহন কোনো কিছুর চেয়ে কি কম?

কালের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীব-বৈচিত্র্য। আর্সেনিক বিষে একাকার হচ্ছে ভূগর্ভস্থ্য পানি। নদী ও সাগর দূষণে লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীজ সম্পদ। জুমচাষে বিলীন হচ্ছে পাহাড়ি জমি, বাড়ছে ভূমিধস, বৃক্ষনিধন। বায়ুমন্ডল ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে গ্রীণ হাউজ গ্যাসের আধিক্যে। জীবন বাঁচাতে প্রতিনিয়ত চলছে নাকেমুখে ছাঁকনি লাগিয়ে বিশুদ্ধ বাতাস নেয়ার বৃথা চেষ্টা। মস্তিস্ক বিগড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ভয়ানক শব্দ দূষণে। এতকিছুর পরও যখন শুনি ২০৫০ নাগাদ বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ তলিয়ে যাবে সমুদ্রগর্ভে তখন বুঝতে বাকি থাকে না আমরা মানুষ জাতি, নিজের ভোগ বিলাসের জন্য বৈরি আবহাওয়া করে তুলছি আমাদের প্রকৃতিকে, আমাদের পরিবেশকে। পরিবেশের এই বিপর্যস্ত অবস্থানে টিভি সংবাদপত্রের কল্যাণে মানুষ খানিকটা হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছে প্রকৃতির এই বৈরিভাব পরিবেশের প্রতি মানুষের বিরূপ আচরণেরই প্রত্যাঘাত স্বরূপ। অতীতে পত্রিকায় পাতায় এত বেশি লেখালেখি হতো না হালে যেমন হচ্ছে। তবে এটাও নিঃসন্দেহে সত্য পরিবেশ দূষণের বর্তমান দৃশ্যপট কয়েক দশক আগের পরিবেশের চেয়ে ভিন্ন। সম্প্রতি দেশের পরিবেশ কতটা ভয়াবহ অবস্থায় আসীন, পত্রিকার পাতায় চোখ না মেললে তা অনুধাবন করা যায় না। তবে হিমালয়ের শত শত ফুট পুরু হিমবাহ ২০৩৫ সালের মধ্যে গলে যাবার যে ভবিষৎবাণী আই পি সি সি করেছিল তা থেকে সরে এসেছে জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত এই প্রতিষ্ঠানটি।

কমে যাচ্ছে সমূদ্রের মাছও, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে জলে-স্থলে ঘটছে একের পর এক নানা ঘটনা। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টে যাচ্ছে জীবনধারা। রোগব্যাধি অর্থনৈতিক সংকট, জীববৈচিত্র্যের সম্ভার ধ্বংস এর সব কিছুই ঘটছে জলবায়ুর আকস্মিক পরিবর্তনের পথ ধরে। এরই মধ্যে একদল মেরিন বিজ্ঞানী আতঙ্কজনক কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন, তাদের ভাষায়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খুব শিগগিরই বিশ্বের মৎস্য ভান্ডারে বড় ধরনের পরিবর্তন হবে। আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার (এএএসএ) ৩৩টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বানী উচ্চারণ করে বলেছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। একই কারণে পাল্টে যাচ্ছে সামুদ্রিক স্রোতের ধারাও। এর পরিপ্রেক্ষিতে কড, হেরিং, রূপচাঁদা ও চিংড়িসহ কয়েক হাজার মাছের প্রগতি দুই মেরুর দিকে ধাবিত হবে। সে কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ আটলান্টিক মহাসাগরের মৎস্যভান্ডার অর্ধেক পরিমাণ কমে যেতে পারে।

* এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, লাইব্রেরি এ্যান্ড ইনফরমেশন ডিভিশন

পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালে যখন দেখতে পাই সৈকতের বেলাভূমিতে ডিম ছাড়তে আসার সময় নিষিদ্ধ জালে আটকা পড়ে একের পর এক মারা যাচ্ছে মা কচ্ছপ। জোয়ারের সময় সাগর জলে ভেসে এসব মরা কচ্ছপ চলে আসছে উপকূলে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ। এ ব্যাপারে গত দুই মাসে প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রিকায় একাধিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও কচ্ছপের মৃত্যুরোধে প্রশাসনের কোনো তৎপরতা নেই। ব্যাঙ-কচ্ছপ-কেঁচো এমনকি শামুক ঝিনুকের সংকটাপন্ন জীবন যখন, তখন বুঝি পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে সংবাদপত্রের ভূমিকাও অপ্রতুল নয়। তারপরও বলবো বর্হিবিশ্বে পরিবেশ রক্ষায় যেখানে বায়োডিগ্রেডিবল পলিথিন আবিস্কৃত হচ্ছে, বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, যেখানে লোকজন সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ পাবার জন্য solar photovoltaic-cell দিয়ে বাড়িঘরের ছাদ পর্যন্ত নির্মাণ করছেন সেখানে আমাদের দেশের পরিবেশ ও পরিবেশ সচেতনতা কালো ধোঁয়া থেকে বাঁচা, আর্সেনিকমুক্ত পানি পান আর বিদেশী প্রজাতির গাছ লাগানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্য সচেতনতা, বৃদ্ধি পাচ্ছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আকুতিও। সচেতনতার এ বিকাশ সাম্প্রতিক নয়, দশক তিনেক আগে ষ্টকহোমে জাতিসংঘের প্রথম পরিবেশক বিষয়ক কনফারেন্সের মাধ্যমেই সূচিত এই সচেতনতা আজ অবধি নিবৃত্ত করতে পারেনি প্রকৃতির দুর্বৃত্তকে। "বুড়িগঙ্গা বাঁচাও", "সুন্দরবন বাঁচাও", "জীব-বৈচিত্র্য বাঁচাও" পত্রিকার এই শিরোনামগুলি আচমকা আনমনা ভাবকে সচকিত করে তোলে, মনে হয় খুব কাছেই কে যেন দুর্বৃত্তের আক্রমনে বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার করে বলে আমাদের সাহায্য প্রার্থনায় মূর্চ্ছা যাচ্ছে। উৎকণ্ঠার সাথে খুঁজে দেখি সে - তো আমাদের পরিবেশ, যার সাথে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের সম্পর্ক, তেষ্টা নিবারণের সম্পর্ক।

বন উজাড়ে বিলুপ্তি ঘটছে বিচিত্র উদ্ভিদ প্রাণী ও নানা রকম অনুজীবের। আবার দূষণ আক্রান্ত হয়ে পানিতেও বিলুপ্তি ঘটছে অজস্র প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর। সমুদ্র নিরাপদ নয়, আকাশও অরক্ষিত। অর্থাৎ জীববৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে নিত্যদিন প্রতিবেশের সর্বত্র আকাশপাতালজমিনে। আবার বাংলাদেশের অধিক সংখ্যক মানুষের মৌলিক চাহিদা সহ দৈনন্দিন চাহিদার যোগান দিতে অপরিকল্পিত নগরায়ন, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন কিংবা অপরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে নিদারুণ পরিবেশ দূষণ ঘটছে এদেশের সব জায়গায়। অধিক মানুষকে বাচাঁতে আমাদের নদী থাকবে না, খালবিল থাকবে না, নদীমাতৃক দেশে পানির জন্য হাহাকার, অবারিত ফসলের মাঠ কমতেই থাকবে, বন থাকবে না, পাহার থাকবে না, থাকবে না বিচিত্র প্রজাতির বৃক্ষ, বন্য জন্তু , বনফুল, পাখি, শীতের সময় শীত থাকবে না, বর্ষা থাকবে না যথাসময়ে, হারিয়ে যাবে বসন্ত। শরতে কাশফুল ফুটবে না। আমরা বাচঁব কি নিয়ে ? পরিবেশ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে-চলছে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানে প্রত্যেক স্থানে। এমতবস্থায় বাংলাদেশের মাটি পানি বাতাস ইতোমধ্যেই অপরিশোধনযোগ্য দূষণে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। বলা যায় প্রতিবেশ ব্যবস্থা জীববৈচিত্র্য ও জনস্বাস্থ্য সম্পুর্নভাবে ধ্বংসোন্মুখ।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে, আজ পদ্মা-নদীতে পানি নেই, গড়াই নদী ধু ধু বালুময় ও এখন মৃতপ্রায়। কারণ ভূমি প্রশাসন মাটি তথা জমির ধরন পরিবর্তন করার এখতিয়ার রাখে। আর সে কারণে নদী, খাল, বিল, হাওর, ডোবা, পুকুর, দীঘি, ঝিল, জলাভূমি, কবরস্থান ইত্যাদি হয়ে যায় বাণিজ্যিক, আবাসিক। কিন্তু কিছুদূর পর পর পুকুর, ডোবা, জলাভূমি, দীঘি, খাল ইত্যাদি না থাকলে জলজ, ভূচর ও খেচর কোনো প্রাণী বাঁচে না। গ্রামেও এখন পাখির কলতান নেই, রাতে শেয়ালের ডাক নেই। 'গ্রামের একটি ঝোপের মাঝে ও তার পাশে একটি/দু'টি কাঠবিড়াল দেখে বললাম আর কোন প্রাণীর বংশ আছে? এলাকার মানুষ বললো, বিলে যখন পানি থাকতো তখন কত পাখি, বন্য প্রাণী দেখা গেছে এখন বিলে পানি নেই; মনে হয় সে কারণে পাখি, জীবজন্তু আসে না। জীববৈচিত্র্য

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মেরুয়ায়নের কারণে। হয়তো এখনই সতর্ক না হলে সবুজ লতা-পাতা, গাছ-গাছালির দেখা মিলবে না অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সবাই এখনই এগিয়ে আসতে হবে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য।

গত ৭ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০১০ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার চোখ বুলায়ে দেখতে পেলাম যে,গোটা বিশ্বের দৃষ্টি ছিল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের দিকে। সেখানে বসেছিল জাতিসংঘের বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ১২ দিনের আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ১২০ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানসহ ১৯২টি দেশের প্রতিনিধি। আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মেলনকে কপ- ১৫ (Conference of the Parties-15) নামে আখ্যায়িত করা হলেও তাৎপর্যের দিক থেকে এটাকে বিশ্ব 'পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্য বাঁচাও' বলাটাই উপযুক্ত। কারণ সম্মেলনের আসল ইস্যুটি ছিল এই দেশ-ওই দেশ বা এই শ্রেণী-ওই শ্রেণীর কোনো দ্বন্দ্বের বিষয় নয়। তা ছিল, পৃথিবী মানুষের বসবাস উপযোগী থাকতে পারবে কি পারবে না, সে বিষয়।

পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর মানব সমাজের অত্যাচার ইতোমধ্যে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এখন তারা প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে। 'উন্নয়ন' ও 'সভ্যতার অগ্রগতিকে' এত বেশি বৈষয়িক উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সমার্থক করে ফেলা হয়েছে যে, খোদ বিশ্ব পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য এখন হুমকির মুখে পড়েছে। উন্নয়নের 'ঠেলায়' বাতাসে এখন যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হচ্ছে তা শোধন করার ক্ষমতা বিশ্ব পরিবেশ ও বনাঞ্চলের নেই। একদিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন ক্রমাগত বাড়ছে, অন্যদিকে 'উন্নয়নের' নামে বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে আরো বেশি পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বনসহ আরো কিছু মারাত্মক ক্ষতিকর গ্যাস মজুত হয়ে গ্রীন হাউজ প্রভাব সৃষ্টি করছে। ফলে সূর্যের তাপ যে পরিমাণে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করছে, তার সবটা বের হতে পারছে না। তাছাড়া এসব গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমন্ডলের বাইরের দিকে যে ওজোন গ্যাসের আবরণ আছে, তা ক্রমেই ক্ষয় হচ্ছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর উপরিভাগের ওজন আবরণে ইতোমধ্যে বড় ফাটল সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। ওজন আবরণের ফলে আগে যেভাবে পৃথিবীর বুকে সূর্যের অতিবেগুনিরশ্মির আগমন বাধাগ্রস্ত হতো, এখন এই ফাটলের ফলে তার প্রবেশ সেই পরিমাণে আটকানো যাচ্ছে না।

গবেষকদলের প্রধান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব অ্যাঙ্গলিয়ার প্রফেসর ড. উইলিয়ামচিউং বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বড় ধরনের ধাক্কা লাগবে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যে, তাই তা সামাল দেয়ার জন্য মৎস্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ও সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঠিক রাখতে আগেভাগে কর্ণ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারি। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, এএএসএ-এর আওতাভুক্ত ৩৩টি দেশের মধ্যে জাতিসংঘ ১৯টি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ ঐসব দেশের খাদ্য তালিকায় মাছ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মাছধরা তা বাজারজাতকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ঐ অঞ্চলের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়তে পারে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, ওজোন আবরণের ক্ষয়বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। একইসাথে এই বৃদ্ধির গতিও বাড়ছে। ফলে বদলে যাচ্ছে পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্য, বিনষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের পানির উত্তাপ, গলে যাচ্ছে পাহাড়ের মাথার বরফ ও মেরু অঞ্চলের হিমবাহ। এসবের ফলে সমুদ্রের পানির স্তর উপরে উঠে আসতে শুরু করেছে। অবস্থা এরকম চলতে থাকলে পানির স্তরের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে উপকূল ধরে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকবে সমুদ্র ও সমুদ্রের নোনা পানি। জলোচ্ছ্বাসের

প্রকোপ বাড়বে, প্লাবিত হতে থাকবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সমুদ্রে তলিয়ে যাবে কোটি কোটি মানুষ ও জীবজন্তুর আবাসভূমি ও বনাঞ্চল। ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপ বাড়লেই বাংলাদেশের প্রায় ১৭% ভূমি সমুদ্রে তলিয়ে যাবে বলে অনেক গবেষক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞানীরা নানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলেছিল, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ ডুবে যাবে। এসব কথাবার্তা যখন বিশ্বজলবায়ু নিয়ে কর্মরত ও জাতিসংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, তখন ভয়ের কার্যকারিতা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। পরিস্থিতির এ ধরনের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকবে চক্রাকারে। অনেকটাই আণবিক বোমার চেইন-রিএ্যাকশনের মতো। কিংবা বোতল থেকে বেরিয়ে পরা দৈত্যের মতো। একবার শুরু হলে বা বেরিয়ে পড়লে থামানোর কোনো সুযোগ নেই। অবধারিতভাবে চক্রাকারে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকবে আমাদের চেনা-জানা পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্য।

'জলবায়ু পরিবর্তনের' টাইম বোমাটি ইতোমধ্যে বিশ্ব পরিবেশের বুকের একেবারে মাঝখানটায় প্রোথিত হয়ে গেছে। টিকটিক করে এগিয়ে চলছে ঘড়ির কাঁটা। মহা প্রলয়ের লক্ষণগুলো স্পষ্ট। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর দেশে দেশে নতুন এক ধরনের উদ্বাস্তুর আবির্ভাব ঘটছে। এরা পরিবেশ বা জীব বৈচিত্র্যের উদ্বাস্তু। লাখের সংখ্যা ছাড়িয়ে এরা এখন কোটিতে পৌঁছতে চলেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব তাপনের প্রভাবে বর্তমানে প্রতিবছর দেড় লাখের বেশি মানুষ শুধু অপুষ্টি ও ম্যালেরিয়ার কারণে মারা যাচ্ছে। এই সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ বেড়ে ৩ লাখ হবে। ২০০৪ সালে 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব তাপনের প্রভাবে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ১০ লাখ প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ ধরনের মহাবিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী কোন দেশ? প্রথমেই আঙ্গুলি নির্দেশ করতে হয় এজন্য সবচেয়ে বড় অপরাধী আমেরিকার দিকে। এদেশের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪% হলেও তার কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ২৬%, মিথেনের ২০% এবং ক্লোরোফ্লুরো-কার্বনের ২৫.৮%। মাথাপিছু হিসাবে নির্গমনের এই হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর চেয়ে এই হার অনেক বেশি। আর বিশ্বের অধিকাংশ দেশ; যেগুলো অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ, তারা এই বিপর্যয়ের জন্য সামান্যই দায়ী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকেই এর ফলে জান-মালে সবচেয়ে বেশি মাশুল দিতে হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে **পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্যে** যে মহাবিপদ আজ উপস্থিত সেজন্য আমেরিকাসহ তথাকথিত উন্নত দেশগুলোই যে চৌদ্দআনা দায়ী, একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এটা কম-বেশি সর্বজন স্বীকৃতও বটে। এই সমূহ মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রধান যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো :

- বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর তাপমাত্রার বৃদ্ধি খুব বেশি হলে ১ থেকে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
- গ্রীন হাউজ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমনের বর্তমান হার নাটকীয়ভাবে ৪০% থেকে ৫০% কমিয়ে আনতে হবে। এই কাজে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে আমেরিকাসহ সেসব উন্নত দেশকেই; যারা এযাবৎকাল এই গ্যাসের সিংহভাগ বাতাসে ছড়ানোর জন্য দায়ী, এবং এখনো তার বেশিরভাগ নির্গমন করে চলেছে।
- ওজন আবরণে যে ক্ষয় হয়েছে তার বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। এজন্য ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন গ্যাসসহ ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে রাশ টেনে ধরতে হবে। এ ধরনের গ্যাস নির্গমনও অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে।
- জ্বালানি চাহিদা মিটানোর জন্য কয়লা ও জীবাশ্ম নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প শক্তির উৎস উদ্ভাবন ও তার অবাধ সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

- পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কাজ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দেশের বিশেষত: বাংলাদেশের মতো সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশের বিশাল ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে। সব দেশকে প্রযুক্তিগত এ্যাডজাস্টমেন্ট করার কাজে সহায়তা দিতে হবে। এই খরচ বহন করতে হবে প্রধানত সেই সব দেশকেই, যারা একদিকে এই ক্ষতির জন্য মূলত দায়ী এবং অন্যদিকে সামর্থ্যবান।

এগুলো সবই এমন জরুরি কাজ যে এক মুহূর্ত সময় অপচয় করার অর্থ হবে পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে ধ্বংসের পথে আরো এক কদম ঠেলে দেয়া। কাজগুলো দ্রুত করতে ব্যর্থ হলে অবস্থা এমন জায়গায় এসে দাঁড়াবে যে, তখন নিশ্চিত ধ্বংস এড়াতে আর কিছুই করার সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না। এই তাগিদ থেকেই বিগত ২/৩ দশক ধরে সারা বিশ্বে হৈচৈ উঠেছে-সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচাতে কিছু কর।

এই বিষয় নিয়ে আগে ১৪টি সম্মেলন হয়ে গেছে। কোপেনহেগেনেরটা ছিল পঞ্চদশতম। পূর্বের এসব সম্মেলনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাপানের কিয়োটো শহরে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি। সেখানে 'কিয়োটো প্রটোকল' নামে চুক্তিতে সই হয়েছিল। অনেক টালবাহানার পর ২০০৫ সালে এই চুক্তি চালু হলেও আমেরিকা আজও এই চুক্তি সই করেনি। এই চুক্তিতে ২০০৮-২০১২ সময়কালের মধ্যে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫.২% কমিয়ে আনার জন্য শিল্পন্নোত দেশগুলোকে বলা হয়েছিল। কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০১২ সালে। এই মেয়াদ শেষের আগেই গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর বাধ্যতামূলক ধারা সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে কিয়োটো চুক্তির গোটা মর্মবস্তুই ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্য নিক্ষিপ্ত হবে নিশ্চিত ধ্বংসের অতল গহ্বরে। আশা ছিল কোপেনহেগেনের ১২ দিনের সম্মেলন শেষে সেরূপ একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া যাবে। কিন্তু, প্রধানত আমেরিকার বাঁধার কারণেই আইনিভাবে বাধ্যতামূলক কোনো চুক্তি সেখানে স্বাক্ষর হয় নি। শুধুমাত্র একটি 'সমঝোতার' ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এবং সেটিতেও সর্বসম্মতির সিল লাগানো যায় নি। কোপেনহেগেন দিতে পারে বাঁচার সনদ অথবা আত্মহত্যার দলিল। এই কথাগুলি বলেছিলেন মুষড়ে পড়া হাইতি দ্বীপের একজন প্রতিনিধি।

পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করার এইসব প্রয়াসে কেন লাগাতারভাবে বৈরীতা করে চলেছে আমেরিকা? এই বৈরীতা ছিল কার্টার, রিগান, ক্লিনটন, বুশ-সব আমলেই। অব্যাহত আছে ওবামার আমলেও। একথা কে না বুঝে যে, পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হলে আমেরিকাও বাঁচতে পারবে না। তারপরেও কেন আমেরিকার সরকারকে কোনো সময়েই জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক আত্মঘাতী পথ থেকে এবং পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষার বিরোধিতা থেকে সরিয়ে আনা যাচ্ছে না? এই রহস্যের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে আমেরিকান রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের দিকে তাকালে। পুঁজিবাদের কবর খোঁড়া হলে তো সেটা ভালোই। কিন্তু পুঁজিবাদের মুনাফা তাড়িত ব্যবস্থার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ধারা যেভাবে চলছে এবং সেই বিপদ নিরসনে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যেভাবে বাঁধা দিচ্ছে তাতে গোটা বিশ্ব পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্যের কবর রচিত হচ্ছে।

কোপেনহেগেনে এবার স্পষ্ট প্রমাণিত হলো- পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ কেবল মেহনতি মানুষেরই শত্রু নয়, সে বিশ্ব পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্যেরও শত্রু। পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচাতে হলে বিপজ্জনক জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে হবে। আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে হলে চাই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন। এই পৃথিবী কারোর একার নয়। বিশ্বের সব রাষ্ট্র এই ধরণী নামক বিশাল পরিবারের সদস্য। পরিবারটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সব সদস্যর

দায়িত্ব। প্রাণী জগতের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে পরিবেশ সংরক্ষণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা অনুসারে শিল্পকারখানা স্থাপন করা উচিত। এতে করে হয়তো পরিবেশ একেবারে দূষণমুক্ত করা যাবে না কিন্তু পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে। পরিবেশ আন্দোলন গোটা বিশ্বের মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার আন্দোলন। তাই আসুন,আমরা সকলে মিলে ভবিষ্যত প্রজন্মকে একটি সুস্থ সুন্দর পরিবেশ উপহার দেওয়ার অংগীকারবদ্ধ হই এবং একই সুরে সকলে বলি ***"সুস্থ পরিবেশ ও আমাদের জীব -বৈচিত্র্য উন্নত জীবনের পূর্ব শর্ত"।***

পরিশেষে বলতে চাই পরিকল্পিত কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্য এবং জলবায়ু দূষনের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালানো দরকার এর কোন বিকল্প নেই। আসুন আমরা সবাই মিলে মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্য দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের এই বাংলাদেশকে পরিবেশ ও আমাদের জীব বৈচিত্র্যকে বৈরী জলবায়ুর কবল থেকে মুক্ত রাখেন, এবং পরিবেশকে সুস্থ্য রাখতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এই লক্ষে-

"দেশ বাঁচলে বাঁচবে তুমি, বাঁচবে সকল পরিবেশ,
দেশের ক্ষতি সবার ক্ষতি, তুমিও হয়ে যাবে নিঃশেষ।
বাঁচার জন্য মাতৃভূমি, বাঁচার জন্য বাংলাদেশ,
বাঁচার জন্য আজ প্রয়োজন সঠিক সুন্দর নির্মল পরিবেশ।

আমরা হয়তো সময়ের সাথে সাথে "কষ্টের আকাশে উড়তে উড়তে, একদিন পেয়ে যাবো কোনো স্বর্গের ঠিকানা, সেদিন হয়তো কোনো কষ্টের স্মৃতি মনে রাখবো না । বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ও জনগণ "পরিবেশ ও আমাদের জীব-বৈচিত্র্য" কে বাঁচাবার জন্য দীপ্ত অবদান রেখে একটি বৈশ্বিক ভূমিকা পালন করবে এ হোক আমাদের আগামী দিনের দৃঢ় প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্রঃ

১। দৈনিক প্রথম আলো এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা ।

২। World Environment Day - ২০০১।

জলবায়ু পরিবর্তনের পরিনাম

-মুহাম্মদ ইব্রাহীম*

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল বিষয়টি ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ বৃদ্ধি। কিন্তু এর ফলাফল আমাদের কাছে আসে শুধু উত্তাপ বৃদ্ধি হিসাবে নয়, বরং এর কারণে সৃষ্ট অন্যান্য নানা ফলাফলের মাধ্যমে। বাংলাদেশের জন্য এবং এরকম আরো কিছু উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চলের জন্য এর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হলো সমুদ্র-উচ্চতা বৃদ্ধি। গড় উচ্চতা সামান্য বাড়লেও এ রকম জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যাওয়া, নদ-নদীর মাধ্যমে অভ্যন্তরে লোনা পানি ঢুকে যাওয়া সহ মারাত্মক বিপর্যয় দেখা যাওয়ার কথা, এবং তা ইতোমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে আমাদের দেশে ও আরো কিছু স্থানে। বিশ্ব-উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-পৃষ্ঠ উঁচু হবার কারণ কিন্তু একটি নয়, অন্তত তিনটি। সবচেয়ে বড় ভূমিকা যার সেটি হলো উত্তাপের ফলে পদার্থ আয়তনে সম্প্রসারিত হয়– এটি সেই সম্প্রসারণ। সমুদ্র-উচ্চতা ৬০%ই বাড়ে এই কারণের। আর একটি কারণ হলো আর্কটিকে ও আন্টার্কটিকায় জমাট বরফ গলার ফলে যে বাড়তি পানি সমুদ্রে এসে যোগ দিচ্ছে তা। উচ্চতা বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা ২৫%। বাকি ১৫% এর জন্য দায়ী হলো পার্মাফ্রস্টের গলার ফলে সৃষ্ট বাড়তি পানি। ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ পার্মাফ্রস্টের উপরিভাগকে বরফশীতল অবস্থায় আনে এবং এর উপরের বেশ খানিকটা পুরু অংশ থেকে পানি বেরিয়ে আসে ও সেখানে জলাভূমির অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই পানি নানা প্রবাহের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র পানিতে এসে যুক্ত হচ্ছে।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে বহুবার সমুদ্র-পৃষ্ঠের সাংঘাতিক উঠানামা ঘটেছে বড় ধরনের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে। এর ফলশ্রুতিতে জীব জগতেও দেখা দিয়েছে অনেক বড় বড় পরিবর্তন, অনেক ব্যাপক বিপর্যয় ও বিলুপ্তি। সর্বশেষ বরফ যুগের শীতলতম সময়ে ১৮ হাজার বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ এখনকার থেকে ১৩০ মিটার নিচে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এখন সমুদ্রের মধ্যে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলো তখন স্থল ভাগ ছিল-অনেক দ্বীপঞ্চল তখন সরু স্থলভাগ দিয়ে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই ১৮ হাজার বছরের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পৃষ্ঠ ১৩০ মিটার উপরে উঠে এসেছে। কাজেই ব্যাপারটি মোটেই অভাবনীয় নয় আর এর মারাত্মক পরিণতিগুলোও নূতন কিছু নয়। কিন্তু মানুষের নিজের দোষে এম কিছু ঘটা এবং তা মানুষের জন্যই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়ার ব্যাপারটিই হবে এক্ষেত্রে নতুন।

গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে অতি সাম্প্রতিক এই সমুদ্র-উচ্চতা বৃদ্ধি ঠিক কতখানি হচ্ছে এর পরিমাপটি অবশ্য সমস্যা সঙ্কুল। এমনিতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা নির্ণয়ের কাজটি বহু দিন থেকে নিয়মিত করা হচ্ছে প্রধানত সমুদ্রের স্থানবিশেষে জোয়ার ভাটার উঠানামা ইত্যাদি মাপার জন্য। এটা করতে টাইড গেজ বা জোয়ার মাপক নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এজন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় টাইড গেজ ষ্টেশন থাকে নিয়মিত জোয়ার ভাটায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা রেকর্ড করতে। সমুদ্রে ঢেউয়ের উতাল পাতালের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে আসল উচ্চতা মাপতে পারার জন্য এতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে টাইড গেজে ৩০ সেন্টিমিটার ব্যাসের এক রকম সিলিন্ডার পানিতে ডুবিয়ে ব্যবহার করা হয় যাতে পানি-তলের নিচ ছিদ্র থাকে। সিলিন্ডারের মধ্যে ঢেউয়ের প্রভাব থাকেনা বলে নিরুপদ্রবে উচ্চতাটি মাপা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে প্রাসঙ্গিক যে গড় পড়তা সমুদ্র-উচ্চতা তা সহজে মাপা সম্ভব। প্রথমত বরফ গলা পানি দ্রুত সর্বত্র বিস্তৃত হয় না। কাজেই এর প্রতিক্রিয়া সব সমুদ্রে দেখা দিতে সময় লাগে। তাছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা শুধু পানির প্রসারণের বা বাড়ার ফলে বাড়েনা, সমুদ্রতল উপরের দিকে জেগে উঠলেও তা বাড়ে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রীণল্যান্ড বা সুইডেন-নরওয়ের কাছে বহুকাল ধরে সমুদ্রতল একটু একটু করে জেগে উঠছে, আবার এর দক্ষিণের অঞ্চলে এটি দেবেও যাচ্ছে। এগুলোকে হিসাবের মধ্যে না নিয়ে আসল পরিমাপ পাওয়া

* অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
নির্বাহী পরিচালক, সি এম ই এস, ঢাকা।

যাবেনা। তাছাড়া মাপার সময় জোয়ার-ভাটার কারণে উচ্চতায় বৈচিত্র্য ঘটছে, স্থানীয় মৌসুমী উত্তাপের কারণে প্রসারণের ফলেও এতে বৈচিত্র্য ঘটছে। যে পানি নদী সমুদ্রে এনে ফেলছে বা বৃষ্টিপাতের ফলে যে নূতন পানি আসছে তার কারণেও ওখানে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হতে পারে। এসবের মধ্য থেকে আসল গড় উচ্চতাটি বের করে আনতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে উপগ্রহ থেকে সমুদ্র উচ্চতা মাপার আরো নিখুঁত ব্যবস্থা হয়েছে। এর থেকে বিভিন্ন জায়গার উপর দিয়ে পরিক্রমণের সময় ঐ জায়গায় একই সঙ্গে সমুদ্রতলের অবস্থান ও সমুদ্রপৃষ্ঠের অবস্থান উভয়টি নির্ণয় করে পানির প্রকৃত উচ্চতা বৃদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

গত ১০০ বছরে পৃথিবীর নানা জায়গায় টাইড গেজ ষ্টেশনগুলো থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে গড়ে সমুদ্র উচ্চতা বেড়েছে প্রায় ২০ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ এ সময়ে বছরে গড়ে বেড়েছে ২ মিলিমিটার। ১৯৯২ সন থেকে নেয়া উপগ্রহ পরিমাপে এ পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২.৮ মিমি বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। তবে একেবারে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসে সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধির হার বেড়ে গেছে। টাইড গেজের পরিমাপে এটি এখন বছরে ৪ মিমি এ দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জায়গায় এর থেকে বেশি বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেমন বাংলাদেশে খুলনা অঞ্চলে বছরে ৫.১৮ মিমি সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ উচ্চতা কী হারে বাড়ে এখন সেটাই তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টি বাংলাদেশের মত দেশে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ নিয়ে আসছে। উপকূল ডুবার বিষয়টি তো আসে সবার আগে- যে যায়গা পানির বাইরে ছিল পরে তা পানির ভেতরে চলে যাচ্ছে। এর ফলে বেশ কিছু বাড়তি প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে- দেশের ভেতর লবণাক্ততা ঢুকে যাচ্ছে, সুপেয় পানির অভাব ঘটছে। তাছাড়া জোয়ারের উচ্চতা বেড়ে নদীর স্বাভাবিক স্রোত কমে যাচ্ছে, এতে নদীতে পলি জমাও বেড়ে যাচ্ছে যা স্রোতকে আরো ধীর ও বন্যাকে ত্বরান্বিত করবে। একই সঙ্গে নদীর গতির মসৃণতা কমিয়ে এতে ঘুর্ণি বাড়াচ্ছে যা নদী ভাঙ্গনে অবদান রাখে। বাংলাদেশের মত নদীমাতৃক দেশে এসব প্রতিক্রিয়া অল্পতেই অনেক বেশি অঘটন ঘটাবার ক্ষমতা রাখে- তাই উদ্বেগটি নানামুখি।

সাইক্লোনের প্রকোপ বৃদ্ধি

গভীর সমুদ্রে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় শক্তিশালী ও গতিশীল হয়ে উপকূলে আঘাত হানলে কী ঘটতে পারে তা আমাদের চেয়ে ভাল করে বোধ হয় আর কেউ বুঝবেনা। এই ঘূর্ণিঝড় জিনিসটি আবহাওয়ার একটি খুব অনিশ্চিত জিনিস, সৃষ্টি হবার ব্যাপারে এর যেমন কোন পূর্বাভাস সম্ভব হয় না, সৃষ্টি হবার পরও তার গতিবিধি বুঝা খুবই দুরূহ। তারপরও আধুনিক বিজ্ঞান এক্ষেত্রে কার্যকর জ্ঞানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে অধিকতর কাজ হয়েছে মেক্সিকো উপসাগরে সৃষ্ট 'হারিকেন' নামে পরিচিত ঘূর্ণিঝড় সমূহ নিয়ে যেগুলো প্রায়শ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ক্যারিবিয় অঞ্চলে আঘাত হেনে থাকে। গত বহু দশক থেকে লক্ষ্য করা হয়েছে যে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নির্দিষ্ট বছর পর পর চক্রে। এতে ১৯৪০, ১৯৬০ আর ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এক একবার শীর্ষে উঠতে দেখা গেছে, তারপর আবার কমেও গেছে। কিন্তু আরো সাম্প্রতিক কালে যা দেখা যাচ্ছে তা হলো এক ধরনের একটানা বৃদ্ধি, চক্রাকারে হ্রাসবৃদ্ধি নয়। সব ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যায় ততটা নয়, বরং সর্বাধিক তীব্রতার ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। অনেকেই মনে করছেন এই বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে।

সমুদ্র বক্ষে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টির পেছনে বড় কারণ হলো সেখানকার উষ্ণতর পানি। এরকম পানি থেকে বাষ্পীভবন বেশী হয়। এগুলো ওখানটায় বজ্র-বিদ্যুৎ ও ঝড়-বৃষ্টি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এক ধরনের ট্রিগারের কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় বাড়তি বাষ্প যখন ঘনীভূত হয়ে পানিতে পরিণত হয় তখন সুপ্ত তাপ বের হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য শক্তি যোগায়। তাই ভূপৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্তাপ

বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড় বিশেষ করে তীব্র আকারের ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সম্ভানা বাড়িয়ে দিতে পারে বৈকি।

তীব্রতার বৃদ্ধি অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়কে ক্যাটাগরি-১ থেকে ক্যাটাগরি-৫ পর্যন্ত কতগুলো শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা হয়। ১৯৭০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়ের জরিপে দেখা যাচ্ছে যে এ সময় সব ঘূর্ণিঝড়ের ভেতরে তীব্রতর শ্রেণীগুলো- ক্যাটাগরি ৪ এবং ক্যাটাগরি ৫ ঘূর্ণিঝড়গুলোই শতাংশের হিসাবে অনেক বেড়ে গিয়েছে। ১৯৭০ এ যেখানে এরা ছিল সব ঘূর্ণিঝড়ের ১৬/১৭ শতাংশ, ২০০৪ এ এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতর হবার প্রবণতা ক্রমে বাড়ছে। হয়তো বা সত্তরের বা নব্বই এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়গুলো যেখানে কয়েক দশক পর পর এসেছে, সেখানে ২০০৭ এর সিডরের মত বা তারো চেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আমরা ঘনঘনই পেতে থাকবো। বাংলাদেশের মত ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাস প্রবণ এলাকার জন্য এটি মারাত্মক সংকেত। প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতে এই প্রবণতাটি কতখানি বাড়বে সেটি, আর কবে আমাদের সহ্য ক্ষমতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

চরম আবহাওয়া সৃষ্টি

গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবে এটি প্রায় সব জায়গাতেই সর্বোচ্চ উত্তাপকে উপরের দিকে নিয়ে যায়। এটি শীতের তীব্রতাকে কমায়-বিশেষ করে মাঝে মাঝে তীব্র শীতের যে শৈত্যপ্রবাহ সৃষ্টি হয় সেগুলো কমায়। অন্যদিকে ইউরোপে যে সব জায়গায় গ্রীষ্মের প্রকোপ আগে মোটেই ছিলনা সেখানেও এখন দাবদাহ দেখা যাচ্ছে, গরমে মানুষ মারাও যাচ্ছে কখনো কখনো। অধিক উত্তাপ উষ্ণতর অঞ্চলে আরো নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে।

অধিকতর উত্তাপ সমুদ্র ও অন্যান্য জলরাশি থেকে অধিকতর বাষ্পীভবন সৃষ্টি করছে। এর ফলে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ইত্যাদি বাড়ছে। কিন্তু মুশকিল হলো যেখান থেকে বাষ্পীভবন হয় বৃষ্টিপাত সেখানেই হয় না। অনাবৃষ্টির জায়গায় যদি এই বাড়তি বৃষ্টিপাতটুকু হতো তা হলে কিন্তু ভালই হতো। কিন্তু আবহাওয়ার যে গতিপ্রকৃতি বাংলাদেশ ও তার কাছাকাছি কিছু জায়গায় প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায় সেগুলোই এই বাড়তি বৃষ্টিকেও সেসব জায়গাতেই নিয়ে যায়। ফলে অতিবৃষ্টি বাংলাদেশে যখন বন্যার প্রকোপ বাড়ায় আফ্রিকার খরা তখন চলতেই থাকে। বরং এটি খরাপীড়ত অঞ্চলে খরা বাড়াতেও পারে-দ্রুত বাষ্পীভবনের একটি ফলশ্রুতি হিসাবে। এভাবে সম্প্রতিককালে অনেক স্থানে অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির প্রকোপ বাড়ছে এবং অন্যত্র খরার প্রকোপও বাড়ছে। এগুলোর জন্য অনেকাংশেই জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করা হচ্ছে, যদিও সম্পর্কটি খুব সরাসরিভাবে প্রমাণ করা দুরূহ।

উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে শৈত্য বৃদ্ধি

ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধি আবার প্রকারান্তে কিছু শীত প্রধান দেশের শৈত্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। সমুদ্র স্রোতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত যে প্রক্রিয়াটি এসব দেশের শৈত্য কমিয়ে রেখেছিল তাতে সমস্যা দেখা দেয়ার মাধ্যমেই এই হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। উপসাগরীয় স্রোত নামে পরিচিত উষ্ণ স্রোতটি মধ্য আটলান্টিক থেকে উষ্ণতর পানিকে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে নিয়ে যায়, যার ফলে সেখানে বৃটেন, নরওয়ে ইত্যাদি দেশে শীত অনেক মৃদু থাকে। এর অভাবে উচ্চ অক্ষাংশের কারণে কানাডার শীত যেমন তীব্র একই অক্ষাংশে থাকা এসব দেশেও অনুরূপ শীত থাকতো। এই উষ্ণ স্রোতটি কাজ করে কিছু চমৎকার প্রক্রিয়ায়। এটি অংশত কাজ করে নিজের অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তনের ফলে, আর অংশতঃ উত্তাপ ও লবণাক্ততার পার্থক্যের কারণে সৃষ্ট সমুদ্র-জলের একটি চক্রাকার আসা-যাওয়ার ফলে। এই শেষোক্ত জিনিসটিকে একটি কনভেয়ার বেল্টের সঙ্গে তুলনা করা য়ায়। মানুষ বা মালপত্রকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত কনভেয়ার বেল্ট সাধারণত উপর দিয়ে কোন স্থানে গিয়ে আবার নিজ দিয়ে ফেরৎ আসে এবং চক্রাকারে চলতে থাকে। উপসাগরীয় স্রোতে সমুদ্রের পানিতেও এমনটি ঘটেছে।

মধ্য আটলান্টিকের উষ্ণ এলাকায় সমুদ্রের পানি উষ্ণ ও হালকা, তাই তা সমুদ্রের উপরের দিকে উঠে আসে এবং উত্তর মেরুর শীতল অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। যাওয়ার পথে উষ্ণতর পানির অধিক বাষ্পীভবন তাকে অধিক লবণাক্ত করে তোলে। মেরু অঞ্চলে যখন পৌঁছে এ পানি তখন যথেষ্ট শীতল ও অধিক লবণাক্ত। শীতল পানি ও লবণাক্ত পানি অধিক ভারী হওয়াতে তা সমুদ্রের অধিক গভীরতায় ডুব দেয় এবং সেখানে থেকেই মধ্য আটলান্টিকের উষ্ণ অঞ্চলে ফেরৎ আসে- আর এভাবেই কনভেয়ার বেল্টের মত চক্রাকার আবর্তনের সৃষ্টি হয়। এটিই সেই উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের একটি বড় কারণ যা উত্তর পশ্চিম ইউরোপকে শীত থেকে রক্ষা করছে। গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়ায় মেরু অঞ্চলে যা ঘটছে তাতে এখন এই উপসাগরীয় স্রোত ব্যাহত হবার উপক্রম হয়েছে। এ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে মেরু অঞ্চলে বেশি ঘটছে ফলে মেরু অঞ্চল ও উষ্ণ অঞ্চলের উত্তাপ পার্থক্য কমে যাচ্ছে- স্রোতের একটি নিয়ামক দুর্বল হয়ে পড়ছে। তা ছাড়া মেরু অঞ্চলে বরফ জমছে কম, গলছে বেশি, যার ফলে ওখানে লবণাক্ততা কমে যাচ্ছে- ডুব দিয়ে উষ্ণ অঞ্চলে ফেরৎ আসার প্রবণতা কমে যাওয়াতে স্রোতের আরো একটি নিয়মক দুর্বল হয়ে পড়ছে। এতদিন উপসাগরীয় স্রোতের এভাবে দুর্বল হওয়ার ব্যাপারটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা পর্যায়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে ইতোমধ্যেই উপসাগরীয় স্রোতে প্রবাহিত পানির আয়তন ৩০% কমে গেছে- যা উত্তর পশ্চিম ইউরোপের উত্তাপ ১০° সে. পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারছে। ভূ-পৃষ্ঠ উত্তাপ যত বাড়বে উপসাগরীয় স্রোতের নিষ্ক্রিয় হবার প্রবণতাও এত বাড়বে। এর ফলে বৃটেন বা নরওয়ের মত দেশের আবহাওয়া ও অর্থনীতির উপর তা চরম আঘাত হানতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অবশ্য ভূপৃষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধি ওসব দেশের জন্য উত্তাপ সৃষ্টি করবে না, বরং করবে শৈত্য সৃষ্টি।

কৃষির উপর প্রতিক্রিয়া

চরম আবহাওয়ার কারণে কৃষির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়- যেমন বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে ফসল বিনষ্টি। অন্যত্র এই চরম আবহাওয়া খরা বৃদ্ধি, উত্তাপে মাটির শুষ্কতা বৃদ্ধি ও উর্বরতা বিনষ্টি, শুষ্কতার ফলে মাটির অবক্ষয় বৃদ্ধি, উত্তাপের ফলে ফসলের ক্ষতিকর কীট পতঙ্গ ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি- ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষির ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটাতে শুরু করেছে। তবে সাধারণভাবে কৃষির ক্ষেত্রে গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফল সর্বত্র এক রকম নয়। নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশের এলাকাগুলোতে উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির ক্ষেত্রে কিছু অনুকূল পরিবেশ বহন করে আনছে। এর কোন কোন অঞ্চলে আগে যেখানে গ্রীষ্মে একটি ফসল শুধু পাওয়া যেত সেখানে এখন ক্ষেত্র বিশেষে দুটি ফসলও আশা করা হচ্ছে। তবে আগের শীতলতর আবহাওয়ার সঙ্গে বহুকাল ধরে খাপ খেয়ে যাওয়া ফসলগুলোর পতিবর্তন সাধন না করে এই সুফলটি নেয়া যাচ্ছে না।

স্বল্প অক্ষাংশ অবস্থিত উষ্ণতর অঞ্চলগুলোতে অবশ্য অধিকতর উত্তাপ, বাষ্পীভবনের ফলে আর্দ্রতা হারানো, উদ্ভিদের অধিকতর প্রস্বেদনে পানি হারানো- এসবের ফল কৃষির ক্ষেত্রে ভাল হচ্ছেনা।

অন্য দিকে অধিকতর কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি অনুকূল প্রভাব ফসলের উপর রয়েছে। বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড সালোক সংশ্লেষণে অবদান রেখে ফসলের ফলন বাড়িয়ে দেয়। এক হিসাবে দেখা গেছে কার্বনডাই অক্সাইড দ্বিগুণ হলে ফলন বাড়বে ৩০%। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য প্রভাবগুলোর তুলনায় কৃষির উপর তার বিরূপ প্রভাব বরং মোটের উপর অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া সবুজ বিপ্লবের মত ফসলের জাতের উপর গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে তাদেরকে সহনশীল করে তোলা খুব বেশি কঠিন নাও হতে পারে।

জীববৈচিত্র্যে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবঃ প্রেক্ষাপট কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

-আমিনা আক্তার *

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আমাদের এ দেশ। সাহিত্যের ভাষায় "অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি" আমাদের এ সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ। দূর্ভাগ্যজনকভাবে এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা কথাটি আজ আর প্রযোজ্য নয়। কারণ- জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তন কথাটা অনেক ব্যাপক যা শুধু তাপমাত্রার অতিমাত্রায় হ্রাস বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগই নয়। বরং এসবের সাথে সাথে প্রাণী বৈচিত্র্যের বিচিত্র সব পরিবর্তনও বোঝায়। আরেকটু পরিস্কার করে বললে, ধরা যাক, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হিসেবে কোন একটি এলাকার মানুষ খেয়াল করল যে, কয়েক বছর ধরে গরমের সময় অত্যন্ত গরম, শীতের সময় অত্যন্ত শীত, আবার বর্ষার সময় অতিবর্ষণের ফলে বন্যা হচ্ছে। তাছাড়া সময়ে অসময়ে বন্যা, অযাচিত ভূকম্পন এ জাতীয় কিছুও হচ্ছে। ঐ সময়ে ঐ জনগোষ্ঠী এটাও খেয়াল করল যে তাদের বসতির পাশে তাদের প্রিয় নদীর চেহারাটাও যেন পাল্টে যাচ্ছে। নদীর যে সুস্বাদু মাছ খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল সেই নদীর মাছ অনেক কমে গেছে। যা আছে তাও আগের মত সুস্বাদু নেই বা তা খাওয়াই যাচ্ছে না। কিছু কিছু প্রজাতি আর দেখাই যায় না। এই জনগোষ্ঠী একটু খেয়াল করলেই দেখবেন যে পুরো ব্যাপারটা অনেক দিন ধরে একটু একটু করে ঘটেছে। এবং এই একটু একটু জমা হয়ে যখন অনেক হয়েছে তখন তারা খেয়াল করেছে। আরও দেখা যাবে যে পুরো ব্যাপারটা একটা আরেকটার সাথে জড়িত। তাদের প্রিয় গ্রামটাকে শহরের মত বানানোর জন্য মিল কারখানা বানাতে হয়েছে। শিল্পায়নের ফলে মানুষ বেড়েছে, তাদের বাসস্থানের জন্য আরও গাছ কাটতে হয়েছে। বসতির শান্তি শান্তি ঠান্ডা ভাবটা চলে গেছে। কলকারখানার বর্জ্য মানুষের ব্যবহৃত বর্জ্যে প্রিয় নদীটি ভরে শীর্ণ হয়ে গেছে, নদীর পানিটাও আর ব্যবহার উপযোগী নেই। ফলে নদীর প্রাণীরাও আর আগের মত সুখে শান্তিতে বাস করতে না পেরে কারও প্রজাতি অনেক কমে গেছে, কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত প্রায়, আর কিছু কিছু প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত।

যাই হোক, এবার আসি মূল আলোচনায়। জলবায়ু পরিবর্তন অনেক ব্যাপক বিষয়। এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, হচ্ছে, হবে এবং হওয়াটা প্রয়োজনীয় বৈকি। তবে এখানে আলোচ্য বিষয় আমাদের অত্যন্ত প্রিয় চিরচেনা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। কারণ ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে যে আমাদের এই অতি আকর্ষনীয় সমুদ্র সৈকতের বালুতে তেজস্ক্রিয়তা বলে একটা ব্যাপার আছে। পুরো ব্যাপারটা বুঝানোর আগে তেজস্ক্রিয়তা কি তা একটু বলা প্রয়োজন এবং সেজন্য পরমানুর গঠন সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

এ মহাবিশ্বে কত কোটি কোটি জিনিস আছে; কত বিচিত্র তাদের ধরণ। একটা থেকে অন্যটা কত আলাদা! কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য জনক বিষয় হচ্ছে এদের সবার গঠনের ধরণ একই রকম। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা সত্যি যে বড়-ছোট সব কিছুর গঠন একই ধাঁচের। বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে, কোন বস্তুকে ভাঙ্গলে বস্তুর শেষ অবস্থা পর্যন্ত পাওয়া যায় পরমানু। পরমানুকে আরও ভাঙ্গা যায়। তখন আর বস্তুর নিজস্ব গুনাগুন থাকে না - বিভক্ত হয়ে যায় ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন সহ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাতে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বস্তুটার ইলেক্ট্রন ও সবচেয়ে ছোট বস্তুটার ইলেক্ট্রন এক, এক ধরনের প্রাণীর ইলেক্ট্রন ও অপ্রানীর ইলেক্ট্রন ও এক। বিভিন্ন বিজ্ঞানী পরমানু ভেঙ্গে দেখিয়েছেন যে, পরমানুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন আর বাইরে থাকে ইলেক্ট্রন। এদের মধ্যে ইলেক্ট্রন হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত, প্রোটন ধনাত্মক ও নিউট্রন চার্জ বিহীন।

* লেকচারার, ওয়ার্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

যেহেতু প্রোটন ও ইলেক্ট্রন পরস্পর বিপরীত চার্জধর্মী, একটি আরেকটির প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। একটি পরমানু আরেকটি থেকে ভিন্ন হয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই প্রোটন সংখ্যার ভিন্নতার জন্য। পূর্বোক্ত নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে প্রোটন থাকে তাকে বলে পারমানবিক সংখ্যা আর প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে বলা হয় আণবিক সংখ্যা। পরমানুর স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকবে, ততগুলো ইলেক্ট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকবে। তাহলে পরমানুটি হবে স্থিতিশীল ও চার্জহীন। আমরা যেসব বস্তু দেখতে পাই বা পাইনা সবগুলোর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এরকম। যে কথাগুলো অনেক সহজে বলা হয়ে গেল, সেগুলো অনেক বিজ্ঞানীর অনেক অনেক বছর অক্লান্ত গবেষনার ফল এবং যত সহজ বিষয়গুলো মনে হচ্ছে এগুলো এতটা সহজও নয়। এর মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে। আজকে সে আলোচনা থাক। যে আলোচনা টুকু করা হল সেটা করা হল তেজস্ক্রিয়তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য।

এবার আসা যাক তেজস্ক্রিয়তা প্রসঙ্গে। পরমানুর গঠনে যে ইলেক্ট্রন, প্রোটনের কথা বলা হল তার সংখ্যা যত বাড়ে পরমানুর আকারও তত বড় হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিউক্লিয়াসের চারপাশের ইলেক্ট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যকার প্রোটনের মধ্যে ভীষণ শক্তিশালী এক আকর্ষণ বল থাকে, যার জন্য পরমাণুর গঠন তৈরি হয়। যেহেতু চার্জযুক্ত কোন কিছুর ধর্মই হচ্ছে সমধর্মীকে বিকর্ষণ করা আর বিপরীত ধর্মীকে আকর্ষণ করা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইলেক্ট্রনগুলো নিজেদেরকে বিকর্ষণ করে আর প্রোটন গুলো নিজেদেরকে। কিন্তু ছোট আকারের পরমানুর মধ্যে সমধর্মীদের মধ্যে বিকর্ষন, বিপরীত ধর্মীদের মধ্যে আকর্ষনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় পরমানুর স্থিতিশীলতায় তেমন কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু অনেক বড় পরমানুর ক্ষেত্রে সমধর্মীদের মধ্যে এই বিকর্ষণ এত বেশি হয় যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলকেও তা হার মানায়। ফলে পরমানুর স্থিতিশীলতা আর থাকে না; বরং পরমানু ভাঙতে থাকে। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা। ১৮৯৬ সালে হেনরী বেকরেল নামে একজন ফরাসি বিজ্ঞানী ভর ২০৬ - এর বেশি, তাদের ক্ষেত্রে এমন হয়। যেমন - ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি। উন্নত বিশ্বের পারমাণবিক বোমা আর ক্যান্সার চিকিৎসার কারনে এই নামগুলো এখন অনেকেরই জানা। যাই হোক, তেজস্ক্রিয়তা আছে যেসব মৌলের এদেরকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় মৌল। এসব মৌলের ক্ষেত্রে যা হয় তা হল, এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কণা ও রশ্মি বিকিরণ করে। সেই সাথে নির্গত হয় বিপুল পরিমান শক্তি। যেহেতু শক্তি নির্গত হয়ে বসে থাকবে না, সে কোন না কোন কাজ করবে, তাই পারমানবিক শক্তির বিভিন্ন উপকরী দিক যেমন আছে, তেজস্ক্রিয়তার বিভিন্ন সমস্যাও আছে এবং আজকের আলোচনা মূলত এটা নিয়েই। তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে, আরও হবে এবং আরো গবেষনার প্রয়োজনও আছে। তাই তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে বলার অনেক কিছু আছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে রশ্মি বিকিরণ করে তাকে বলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। যে পদার্থ যত বেশি তেজস্ক্রিয়, তা থেকে বিকিরণের সম্ভাবনাও ততবেশি; আর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যত বেশি হবে, তা থেকে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির আশঙ্কাও ততবেশি থাকে।

তেজস্ক্রিয়তা থেকে কি কি সমস্যা হতে পারে তা বলার আগে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে কিছু বলা যাক। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত হচ্ছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। ১২০ কি. মি. দীর্ঘ এই সমুদ্র সৈকতটি বাংলাদেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান। পর্যটন কেন্দ্র হওয়ার কারণে শুধু সমুদ্র সৈকতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন লোকের জীবিকার উৎস। অর্থাৎ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সাথে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন প্রাণী বৈচিত্র্য যেমন সম্পর্কিত, তেমনি আশেপাশের লোকজনও জড়িত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকজতের বালু "অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়"। অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় মানে হচ্ছে এখানকার বালুতে এমন কিছু পদার্থ মিশে আছে যা অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বালুতে যেসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে সেগুলোর তালিকা নিচে দেয়া হলঃ

১। জিরকন
২। গারনেট
৩। রুটাইল
৪। ইলমেনাইট
৫। ম্যাগনেটাইট

এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থের আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা অনেক বেশি। আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা বেশি মানে হচ্ছে এগুলোর ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের পরিমানই সবচেয়ে বেশি। আরও কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় মৌল আছে তবে সেগুলোর এতটা গুরূত্বপূর্ণ পরিমান নেই।

নিচে উল্লেখিত পদার্থ সমূহের মধ্যে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলঃ

মৌল	ইউরেনিয়াম	থোরিয়াম
জিরকন	৯২১২	১৪৮২
গারনেট	১৭৬৫	১১৩৭
রুটাইল	৭০০	৯২০
ইলমেনাইট	৯৫	২০৩
ম্যাগনেটাইট	২৫	৫৫

এই তালিকা থেকে পদার্থগুলোর তেজস্ক্রিয়তার তুলনা করা যা এভাবেঃ
জিরকন>গারনেট>রুটাইল>ইলমেনাইট>ম্যাগনেটাইট অর্থাৎ এদের মধ্যে জিরকন সবচেয়ে বেশি তেজস্ক্রিয় ও ম্যাগনেটাইট সবচেয়ে কম।

এখানে একটা বিষয় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করা হয় যে একক দিয়ে তার নাম বেকরেল প্রতি কেজি ($Bq\ Kg^{-1}$)। অর্থাৎ প্রতি কেজিতে কত বেকরেল। বেকরেল হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের একক। কোন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা এক বেকরেল বলতে বুঝায় প্রতি সেকেন্ডে ঐ পদার্থ থেকে একটি অনু অন্য অনুতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রত্যেকটি রূপান্তরের সময় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সহ শক্তি নির্গত হয়। আমাদের যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে তা মূলত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দু'ভাবে ক্রিয়া করে; প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ও পরোক্ষ ক্রিয়া। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ঘটে বিকিরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত থাকলে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত শক্তির বিকিরণ হলে আমাদের শরীর যেসব টিস্যু দিয়ে গঠিত তার অনু প্রভাবিত হয় যা পরে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের মিউটেশন ঘটায়। ফলে জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের প্রবাহ ব্যাহত হয়। অর্থৎ সাধারণ ভাবে যা এক জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে যেত তা বাধাগ্রস্ত হয়। এর পরিমান বা সম্ভাবনা কতটুকু তা এখনও পুরোপুরি যাচাই করা সম্ভব হয়নি, কারণ তা যাচাই করতে হলে বিপুল প্রাণী গোষ্ঠীর উপর গবেষনা করা প্রয়োজন যা এখনও সম্ভব হয় নি।

পরোক্ষ ক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সাথে জড়িত। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া শরীরের যে কোন অংশে ঘটতে পারে। যখন শরীরের কোন প্রোটিন বা নিউক্লিক এসিডে ঘটে তখন ক্ষতিগ্রস্ত পরমানুর জন্য নির্দিষ্ট প্রভাব দেখা যায়। আমাদের শরীরের বেশির ভাগই হচ্ছে পানি। ক্ষতিগ্রস্ত পরমানুটি পানিকে ভেঙে অত্যন্ত সক্রিয় মুক্ত মূলক তৈরি করে যেটা রাসায়নিকভাবে বিষাক্ত এবং তা তার এই বিষাক্ততা অন্যান্য পরমানুতেও ছড়িয়ে দিতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব নিয়েও কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব দুই রকমঃ

১। তীব্র প্রভাব

২। বিলম্বিত প্রভাব

তীব্র প্রভাবের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রতি লক্ষ্যবস্তু অতি অল্প সময়ের জন্য থেকেও প্রভাবিত হতে পারে। তীব্র প্রভাবের মধ্যে আছে অরুচি ও বমিভাব, ক্লান্তি ও অবসাদ, শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, রক্ত কণিকায় পরিবর্তন ইত্যাদি। এসব প্রভাব সাধারণত সাথে সাথেই দেখা যায়। আরেক ধরনের প্রভাব যাকে বলে বিলম্বিত প্রভাব। এটা কম তেজস্ক্রিয় উৎসের প্রতি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত থাকলে হয়। এটা এভাবেও হতে পারে যে, কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শরীরে প্রবেশ করল আর তা শরীরের ভিতরেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এক্ষেত্রে যেসব ভয়াবহ পরিণতি হয় তার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার যেমন- হাড় ক্যান্সার, রক্তের ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি। এছাড়া এ ধরনের বিলম্বিত প্রভাব আমাদের জীনেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

এতক্ষণ যত প্রভাবের কথা বলা হল এতে কারও মনে হতে পারে যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত কোন স্বাস্থ্যকর স্থান নয় বরং মৃত্যুফাঁদ। কিন্তু ব্যাপারটা এতটা ভয়ংকর নাও হতে পারে। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করা প্রয়োজন। এখানে শুধু তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে সম্ভাব্য বিপদের সম্ভাবনাগুলোর কথা বলা হল যা বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফল। তবে সৈকতের বালুতে যে তেজস্ক্রিয়তা আছে সেটা নিশ্চিত। এখন দেখা দরকার এর কতটা প্রভাব জীব বৈচিত্র্যের উপর পড়ছে। সমুদ্র সৈকতের বালু তো আর তেজস্ক্রিয় নয় বরং তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশ্রিত। ঐ সব বালু থেকে উল্লেখিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ আলাদা করে তাদের আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা মেপে দেখা হয়েছে। সমুদ্র সৈকতের বালু থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ গুলো আলাদা করার কাজটি করে Beach Sand Minerals Exploitation Center (BSMEC)। এখানে সংগৃহীত নমুনা থেকে পাইলট প্লান্টের মাধ্যমে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো বালুতে মিশ্রিত অবস্থায় আছে কাজেই যত সামান্যই হোক ঝুঁকিও আছে। তবে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালুতে আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা খুব বেশি নেই। শুধু বালুতে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের গড় সক্রিয়তা ঘনত্ব ১৯ থেকে ১২১ ও ৩০ থেকে ১২২ $Bq\ Kg^{-1}$। কাজেই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। যেহেতু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সাথে বিপুল পরিমান জনগোষ্ঠীর সাথে BSMEC তে কর্মরত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীই শুধু নয়, সমুদ্রে বসবাসরত প্রাণীকুল ও জড়িত, তাই এ সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তারিত গবেষনা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের অতি প্রিয়, বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত আমাদের প্রাণী বৈচিত্র্যের জন্য কোন ধরনের হুমকি তৈরি করছে না তো!

পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের অবদান

-ড. মোঃ মোহসীন উদ্দিন *

বৃক্ষ মানব জাতির পরম বন্ধু। সে তার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের হাত আমাদের চার পাশে ছড়িয়ে রেখেছে। এ নিঃস্বার্থ বন্ধুর অকৃত্রিম দানে ও পরম মমতায় জীবজগতসহ আমরা বেঁচে আছি। বৃক্ষ ব্যতীত ধরা পৃষ্ঠে মানব জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। মানব সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, উন্নতি অবনতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, সমুদ্র যাত্রা, আকাশ যাত্রা ইত্যাদি মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বৃক্ষের সহযোগীতা ছাড়া সচল রাখা অসম্ভব ও অকল্পনীয়। মানব শিশু ভূমিষ্ট হলে মুখে সে মধু দিয়ে জীবনের যাত্রা শুরু করে এবং জীবন শেষে যে কফিনে শুয়ে পরপারের পথে কবরে আশ্রয় নেয় সেখানেও বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেনের প্রয়োজন তা বৃক্ষেরই দান। অপর দিকে জীব জগতের জন্য ক্ষতিকর কার্বনডাই অক্সাইড যা আমরা প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ু মন্ডলে ছেড়ে দেই, বৃক্ষরাজি তা শোষণ করে বায়ু মন্ডল কে নির্মল ও বিশুদ্ধ রাখে। এ কারণেই মহান রব্বুল আলামীন মানুষ ও জীবজগতের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ হিসেবে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ গাছালী, বৃক্ষ-লতা, ফল-মূল ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন-

মানব তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। এরপর আমি ভূমি বিদীর্ণ করেছি। অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আংগুর ও শাক সব্জি, যাইতুন ও খেজুর। ঘন উদ্যান, ফল ও ঘাস। তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুর জীবিকার জন্য। (আবাসা ২৪-৩২) মাছ-গোস্ত, পোলাও-কোর্মা ইত্যাদি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী যে আগুন দিয়ে পাক করা হয় সে আগুন গাছ দিয়েই জ্বালাতে হয়। আল্লাহ বলেন-

"তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি? তোমরা কি বৃক্ষ সৃজন করেছো না আমি সৃষ্টি করেছি? (সুরা ওয়াকিয়া ৭১-৭১)"

মানব জাতির এ ধরাধামে আগমনেও বৃক্ষেরই ভূমিকা রয়েছে। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া (আঃ) জান্নাতে পরম সুখে দিনাতিপাত করছিলেন। তাঁরা নির্দিষ্ট গাছের ফল খেয়ে ফেলেছেন বলেই জান্নাত থেকে মর্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

"তোমরা ও গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের দল ভুক্ত হয়ে যাবে। অনন্ত র শয়তান তাঁদের উভয়কে সেখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তাঁরা যে সুখ স্বাচ্ছন্দে ছিল তা থেকে তাদের বের করে দিল। এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের দুশমন হয়ে। তোমাদের সেখানে কিছু কাল অবস্থান করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। (বাকারা ৩৫-৩৬)"

আদি মাতা পিতার দেহের আচ্ছাদনঃ

বিশ্বের প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) পরম সুখে জান্নাতি পোষাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে বেহেশ্তে বসবাস করছিলেন। কিন্তু যখন শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করলেন তখন তাঁদের দেহ থেকে জান্নাতি পোষাক খুলে গেল। এমতবস্থায় তাঁদের লজ্জা নিবারণের জন্য তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দেহে জড়িয়ে নিলেন। আল্লাহ বলেন-

অনন্তর তাঁরা যখন গাছের ফল আস্বাদন করলো তখন তাঁদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা নিজের দেহের উপর জান্নাতের গাছের পাতা জড়াতে লাগলেন। (আরাফ ২২)

* সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

কথিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) তিনটি পাতা দিয়ে এবং মা হাওয়া পাঁচটি পাতা দিয়ে তাঁদের দেহ ঢেকে ছিলেন। একারণেই মৃত মহিলাদের কাফনের জন্য পাঁচখন্ড এবং পুরুষদের কাফনে তিন খন্ড কাপড় ব্যবহার করা হয়।

মূল্যবান রেশমী বস্ত্রঃ

গুটি পোকার মাধ্যমে তুত গাছ থেকে তৈরী হচ্ছে মূল্যবান রেশমী বস্ত্র। যা ধনীর দুলাল দুলালীদের দেহের শোভা বর্ধন করে ও তা বিদেশে রফতানী করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

কাগজঃ

বিশ্ব সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার প্রসার কাগজের উপরই নির্ভরশীল। এ অতি প্রয়োজনীয় কাগজ ও তৈরী হচ্ছে গাছ থেকে। কাগজ শিল্পের সাথে জড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহ হচ্ছে গাছেরই বদৌলতে। জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় ঔষধ আল্লাহর সৃষ্ট এ গাছেরই অবদান।

যাবতীয় বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, উড়োজাহাজের চাকা, বাস মোটর চাকা, চাকার টিউব, পানি সরবরাহের পাইপ লাইনের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে রাবার গাছ থেকে।

মূল্যবান আসবাব পত্র, চেয়ার টেবিল, খাট পালং, গরীবের ভ্যানগাড়ী, ঠেলাগাড়ি, পিড়ি, চৌকি ইত্যাদিও গাছেরই অবদান। মরু ভূমির মনোরম মরুদ্যান, রাস্তার পাশে গরীবের বিশ্রামাগার ইত্যাদিও ছায়াদার বৃক্ষের অবদান। জেলেদের নৌকা, মাছধরার যন্ত্রপাতি, কৃষকের লাংগল-জোয়াল, খন্তা, কুড়াল, কাস্তে, কোদাল ইত্যাদি অতীব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আছার গাছ ও বাঁশ থেকেই সংগৃহীত।

রাজশাহীর ফজলী আম, লেংড়া, গোপালভোগ, আম্রপলি, চসা, শিবপুরের কাঁঠাল, মঙগল বাড়িয়ার লিচু ইত্যাদি মজাদার ফল মূল গাছেরই অবদান।

যে পোশাক পরিচ্ছদ পরে মানুষ সভ্যতার খাতায় নাম লেখায়, ইবাদত বন্দেগী করে, শীত গ্রীষ্ম থেকে দেহ রক্ষা করে সে পোশাকের সুতাও তৈরী হয় তুলাগাছের তুলা থেকে। সুতরাং মানুষ্য জীবনের সর্বক্ষেত্র গাছের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। গাছ থেকে পৃথক করে মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না।

উপরে বর্ণিত গাছের উপকারিতা ব্যতীত জীব জগতের বাঁচার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় যে সেবাটি গাছ দেয় তা হলো অক্সিজেন সরবরাহ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা। অক্সিজেনের অভাবে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত না হলে পরিবেশ দূষণ ঘটে। আর পরিবেশ দূষণের ফলে মানব সভ্যতা চরম হুমকির সম্মুখীন হয়।

পরিবেশ মহান রব্বুল আলামীনের দান। মানুষ তথা জীব জগতের বাসযোগ্য এলাকাই হলো তার পরিবেশ। অর্থ্যাৎ মানুষ ও প্রাণীকুল যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বসবাস করে তাই তার পরিবেশ। পরিবেশ মানব সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ। পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েই মানুষ এবং অপরাপর প্রাণীকুল ও উদ্ভিদে জীবনের বিকাশ ঘটে। বিখ্যাত পরিবেশবিদ মাকাইভারের মতে জীবন ও পরিবেশ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। জীব জগত ও তার পরিবেশের মধ্যে প্রতি নিয়ত জীবন রক্ষাকারী

উপকরণের আদান প্রদান চলছে। এ আদান প্রদানের ভারসাম্যের উপরই জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রুপে নির্ভরশীল। মার্সটনবেট্স নামক অপর একজন পরিবেশবিদ বলেন- পরিবেশ হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থার সমষ্টি যা জীবনের বিকাশ কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের মধ্যে যে স্নেহ-প্রেম, প্রীতি-ভালবাসা, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাংখা, উৎসাহ উদ্দীপনা, সুখ-শান্তি, শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্ম প্রেরণা উপলব্ধি করা যায় তা পরিবেশেরই দান। সুতরাং দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা মানব সমাজের অপরিহার্য দায়িত্ব। পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে পরিবেশ দূষণ ঘটে। আর পরিবেশ দূষণের কারনেই মানব সভ্যতা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

"তিনি (আল্লাহ) আকাশ কে সমুন্নত করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মানদন্ড যাতে তোমরা এ ভারসাম্য লংঘন (বাড়াবাড়ি) না কর। (সুরা আর রাহমান ৭-৮)।"

কিন্তু মানুষ স্থায়ী সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহান রব্বুল আলামীনের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ উপেক্ষা করে মানুষ গাছ কেটে বনভূমি সাবাড় করেছে। পাহাড় কেটে ভূমি সমতল করছে। নদীতে বাধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করছে। জীবানু অস্ত্র ও নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে বিস্তীর্ণ এলাকা পুড়ে দিয়ে জীব জন্তু ও কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে ফেলেছে। সুতরাং পরিবেশের ভারসাম্য হীনতার কারনে আজ যে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য মানুষ ও মানুষের কর্মফলই দায়ী। পবিত্র কুরাআনে আল্লাহ তাআয়ালা ঘোষণা করেছেন-

"জলে ও স্থলে মানুষের কৃত কর্মের দরুনই বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। (সুরা রুম-৪১)"

পরিবেশ দূষণের সূত্রপাতঃ

মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথেই পরিবেশ দূষণের সূত্রপাত ঘটে। আদিম যুগে পৃথিবীতে যখন থেকে আগুনের ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকেই বৃক্ষ নিধন ও প্রাণ প্রদায়ী অক্সিজেনের ধ্বংস আরম্ভ হয়। আর এই বৃক্ষ নিধন ও অক্সিজেন ধ্বংসের সাথে সাথে এর ধোঁয়া ও ভস্মকনায় পরিবেশ দূষিত হতে থাকে। সভ্যতার বিচিত্র বিকাশের প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশের ভারসাম্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি অসংখ্য শিল্পকারখানা গড়ে উঠে। নবজীবনের প্রাচুর্যে, যানবাহনের আধিক্য দেখা দেয় রাজপথে। সবুজ বিপ্লবের নামে জমিতে অপরিমিত কীট নাশকের ব্যবহার।

বিগত শতাব্দীতে দু'টি মহাসমরে জনপদে লক্ষ লক্ষ টন বোমা বর্ষণ, পাশ্চাত্য পরাশক্তি সমূহের আনবিক বোমার পরীক্ষার তেজস্ক্রীয়তা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাশে ও অন্তরিক্ষে। ফলে পরিবেশ দূষণ বেড়ে যায় ব্যাপক থেকে ব্যাপক হারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে আনবিক বোমা বর্ষণ করলে লক্ষ লক্ষ লোক পঙ্গু হয়ে যায় এবং সমুদ্রের মাছ মরে যায়, পাহাড় ও বনভূমি বিরাণ হয় ফলে পরিবেশ দূষণের হার বেড়ে যায় বহু গুণে। একই ভাবে ভিয়েতনামের গৃহ যুদ্ধের সময় আমেরিকা সেখানে লক্ষ লক্ষ টন আগুনে বোমা ও অন্যান্য জীবানু বোমা নিক্ষেপ করে বনভূমি ধ্বংস সহ অসংখ্য মানব সন্তান হত্যা করেছে।

ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ দূষণের হার মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানেও যুদ্ধবাজ মার্কিন পরাশক্তি আফগানিস্তানে নাপাম বোমা ও পাহাড় বিধ্বংসী বোমা নিক্ষেপ করে পাহাড় পর্বত ধ্বংস সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বনরাজি ধ্বংস করেছে। ইরাকেও মার্কিন যুদ্ধবাজরা অসম ও অমানবিক যুদ্ধ চালিয়ে ইরাককে ধ্বংস্তুপে পরিণত করেছে এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রা বহুগুন বৃদ্ধি করেছে। উপরোক্ত পরিবেশ বিরোধী ক্রিয়া কান্ডের ফলে বায়ু মন্ডল দূষিত হয়ে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কুফলঃ

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার দরুন পৃথিবীতে তাপ মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বরফ গলার পরিমান বেড়ে যাবে। তারই ফলশ্রুতিতে বাড়তে থাকবে সমুদ্রের পানির উচ্চতা। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপকুলবর্তী নিম্নাঞ্চল ও সাগরে অবস্থিত দ্বীপগুলো তলিয়ে যাবে। ইতোমধ্যে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবী থেকে ৭৬৫ রকমের প্রাণী ও কয়েক হাজার প্রকারের গাছ পালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ১৩২ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ২৫ প্রজাতির পাখির বংশ বিলুপ্তির পথে। লক্ষ লক্ষ একর জমি মরু ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধের ফলে বাংলাদেশে নদী ভাংগন, অকাল বন্যা, জলোচ্ছাস ও মরুকরণ দেখা দিয়েছে। সুন্দরবনের বনভূমি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। প্রতিবছর কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া থেকে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রচুর পরিমান কার্বনডাই অক্সাইড জমা হচ্ছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে বোমা বর্ষনের ফলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে এ সুন্দর পৃথিবী অচিরেই মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার সাথে বনজ সম্পদের বিনষ্ট পরিবেশের ওপর আর এক মারাত্মক আঘাত হানছে। বিশেষজ্ঞদের মতে- একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। সে তুলনায় আমাদের দেশে বনভূমির পরিমান অপ্রতুল। আমাদের দেশে বনভূমির পরিমান মোট আয়তনের শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র। কোন কোন তথ্য মতে ৯ ভাগ। তদুপরি নির্বিচারে বৃক্ষ কর্তন ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বনভূমির পরিমান ক্রমশ্য হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে বিশ্ববাসী আজ মহা সংকিত। এ ভাবে আর ক'বছর চলতে থাকলে দেশে বনভূমি হ্রাস পেয়ে মহা বিপর্যের সৃষ্টি করবে। মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পশু-পাখি সহ কোন প্রাণীই বেঁচে থাকবে না। দেখা দেবে ভয়াবহ অবস্থা। বিধ্বস্ত হবে সভ্যতা, ধ্বংস হবে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব।

পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের ভুমিকাঃ

পরিবেশ দূষণের ফলে ও পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্যহানী, রোগ শোক অর্থ ও সম্পদের অপচয় সহ যে সব ক্ষতি সাধিত হয় তা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায় বের করতে হবে। যুদ্ধবাজ দেশগুলোকে যুদ্ধ বন্ধের, নাপাম বোমা ও জীবানু অস্ত্র ব্যবহার থেকে বিরত রাখার জন্য বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে হবে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও নদীতে বাধ নির্মানের দ্বারা অপরদেশ কে পানি থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা রোধের জন্য শক্তিশালী আঞ্চলিক ব্যবস্থা কায়েম সহ বর্তমান জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ সংস্থায় পরিণত করতে হবে। কলকারখানার বর্জ্য নদীতে বা সমুদ্রে না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। যত্রতত্র ও আবাসিক এলাকায় কল-কারখানা স্থাপন বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি নিবিড় বনায়নের জন্য পরিকল্পনা সহ প্রত্যেক নাগরিককে বৃক্ষ রোপনের সুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তাছাড়া বায়ূ দূষণের বেলায় কীট পতঙ্গ নিধনে জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ, রাসায়নিক পদার্থের শোধন, ধোঁয়ার পরিশ্রুতি কারণ, বসতি ও শিল্পঞ্চলের মাঝে নিরাপদ দুরত্ব রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। পানি দূষণ দূর করার জন্য রাসায়নিক পদার্থ ও ময়লার বিশোধন দরকার।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় হলো বনায়ন। বনাঞ্চলের জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৃক্ষ পরিবেশের দূষণ গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার মারাত্মক বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করে। বনাঞ্চলের জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৃক্ষ পরিবেশের দূষণ গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার মারাত্মক বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করে। বনাঞ্চল বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে ও মরুকরণ প্রতিরোধ করে। বনভূমি বন্য প্রাণী ও পাখিদের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। গাছপালা মাটির ক্ষয়রোধ করে। এবং বন্যা ও ঝড় তুফান থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এক কথায় মানুষ ও

প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৃক্ষের অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

নির্বিচারে বৃক্ষনিধনের অপকারিতা ও বৃক্ষ রোপনের উপকারিতা পশ্চিমা বিশ্ব আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ইসলামের নবী আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আজ থেকে পনের শত বছর পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের এই বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। বনায়নের উপকারিতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য পন্ডিত গণের কথায় এদেশবাসী যত গুরুত্ব দেবে তার চেয়ে অকে বেশী গুরুত্ব দেবে এ সম্পর্কে প্রিয় রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান যদি একটি বৃক্ষের চারা রোপন করে এবং এ বৃক্ষের ফল যদি কেউ আহার করে তা হলে তা রোপনকারীর জন্য সাদকা করার সমতুল্য সওয়াব হবে। এর ফল যদি চুরি হয় তাও তাঁর জন্য সাদকা হবে। আর যদি কোন হিংস্র জন্তু কিংবা কোন পাখি তা খায় তাও তাঁর জন্য সাদকার সওয়াব হবে। আর কেউ কিছু নিয়ে গেলেও তাঁর জন্য তা সদকাই হবে। (বোখারী)।

হাদীসে দেখানো হয়েছে যে, বৃক্ষ রোপন করলে শুধু ইহকালীন লাভই হবে না বরং পরকালেও বিরাট কল্যাণের অধিকারী হওয়া যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে, বৃক্ষ মানব জাতির পরম উপকরী বন্ধু। সুতরাং বন্ধুর সংখ্যা যত বাড়ানো হবে মানবকুলের তত বেশী উপকার হবে। অন্য হাদীসে আছে-

বৃক্ষ রোপনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যদি দেখ যে কিয়ামত কায়েম হতে যাচ্ছে এমতবস্থায় যদি তোমার হাতে কোন চারা থাকে এবং তা রোপন করার মতো সময় পাও তবে তা রোপন করে ফেল। বৃক্ষ রোপনের জন্য এ হাদীসের মত জোরদার আর কোন হাদীস আছে বলে জানা নেই।

প্রিয় দেশবাসী! আসুন, প্রত্যেকেই বাড়ির আঙ্গিনায়, পথের পাশে খালি জায়গায় বৃক্ষের চারা রোপন করে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখাই। পরিবেশের বিপর্যয় থেকে প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষা করে আর্থিক ভাবে লাভবান হই এবং আল্লাহর সৃষ্টি প্রাণীকুল রক্ষায় ব্রতী হই।

পরিবেশ রক্ষায়-বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন

-খাজা ওয়ালিউল্লাহ *

সেই যে ছোট বেলায় বইতে পড়েছিলাম, আমাদের চার পাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। মানুষ, গাছ-পালা, বন্যপ্রাণী, নদনদী, খাল-বিল, পাহাড়-টিলা, এই সব কিছুই আমাদের পরিবেশের অংশ। এই পরিবেশ ধ্বংসের কারনেই আজ জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, এবং কারণগুলো মূলতঃ মানব সৃষ্ট। প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ননয়, একে অপরের উপরে নির্ভরশীল। আমাদের পরিবেশকে রক্ষার উপরই আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর। অথচ নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ও পাখি শিকারের ফলে আমাদের দেশ থেকে দ্রুত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই এর প্রমান পাওয়া যায়। আমাদের দেশের একশ্রেণীর অর্থলোভী, অসাধু, অসচেতন ও শিকার প্রিয় লোকজন এসব, বন্য প্রাণী নিধনের সাথে জড়িত। নির্বিচারে কাটা হচ্ছে পাহাড়, বন উজার হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন আমাদের এই পৃথিবীকে আমরা অনিবার্য ভাবে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিচ্ছি। তাইতো পৃথিবীর পরিবেশবাদী সংগঠন গুলো আজ একত্রিত হয়ে আওয়াজ তুলেছে, "আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী একে বাঁচাও"। বর্তমানে পরিবেশ সম্পর্কে দু'শরও বেশী আইন রয়েছে। এই আইনগুলি প্রধানত ভূমি ব্যবহার, বায়ু ও পানি দূষণ, বনসংরক্ষণ, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, উপকূলীয় বনাঞ্চল ব্যবস্থাপক পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শব্দ দূষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত। বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য অনেক আগে থেকেই আইন রয়েছে, যার মাধ্যমে বন্য প্রাণী, পাখি ও অন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয় যে, দেশে বন্য প্রাণী ও পাখি সংরক্ষণের জন্য আইন ও বিধি বিধান থাকলেও সেগুলো পর্যাপ্ত জনবল সংকট, দেখাশুনা ও জবাবদিহিতার অভাবসহ নানা কারণে কার্যকর হচ্ছে না। তাই অনিবার্য কারণে দিন দিন বাংলাদেশের বন্য প্রাণী ও পাখি নিধনের ঘটনা বেড়েই চলেছে, যা ভবিষ্যতে আমাদের পরিবেশের জন্য এক অশনি সংকেত বটে।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা ঃ

কল কারখানার, ইটভাটা, ও রান্নার কাজে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বনাঞ্চল কেটে উজার করা হচ্ছে, এতে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। বন্য প্রাণী তার প্রজনন ক্রিয়ায় মারাত্মক ভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, বংশ বৃদ্ধিতে এসেছে স্থবিরতা, আর তার প্রভাবে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। ফলে পৃথিবীতে মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে, যা গুরুত্ব পেয়েছে ২০০৯ সালের ৭-১৮ ডিসেম্বর কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্ত:সরকারী প্যানেল বা আইপিসিসি দেখিয়েছে যে গত ১০০ বছরে বিশ্বের তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১৯৬১ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত এক দশমিক আট মিলিমিটার বেড়েছে, বেশি অঞ্চলজুড়ে এবং বেশি সময় ধরে খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের পরিস্থিতি অনেকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কৃষি উৎপাদনের এই ক্ষতির পরিমান এশীয় দেশগুলোতে শতকরা ১০ ভাগ এবং আফ্রিকায় শতকরা ১৭ ভাগ হতে পারে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমান হারে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাড়তে থাকলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে গম উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ, ধান উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ এবং ভুট্টা উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগ কমে যেতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার ১৬০ কোটি লোকের জন্য পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ গত ৩০ বছরে দেড় কিলোমিটার স্থানচ্যুত হয়েছে। মূলত বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বরফ গলে যাওয়া হিমবাহ স্থানচ্যুত হয়েছে। ফলে বনাঞ্চল

* আইনজীবী

পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, বন্যপ্রাণী তার স্বাভাবিক পরিবেশ হারাচ্ছে, ও তার বংশবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

বিপন্ন জীব বৈচিত্র্য ঃ

এক সময় বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর ছিল। তা এখন অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। সামান্য যা অবশিষ্ট আছে, তাও এখন উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি। বনাঞ্চল এলাকায় তেল, গাস উত্তোলন, তার পরিবেশর উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। এক সময় বাংলাদেশে ছিল এমন বহু বন্য প্রাণী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির দিকে এগুচ্ছে। বাংলাদেশ এখন "পরিবেশগত সংকটাপন্ন অবস্থা" হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সুন্দরবন, কক্সবাজার, টেকনাফ সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, ইত্যাদি অঞ্চলে মানুষের হামলা, দূষণ, শিল্পায়ন, অবাধ শিকারের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির বন্য প্রাণী পরিবেশগত বিপর্যয়ের মোকাবেলায় টিকতে না পেরে তাদের অস্তিত্ব হাড়িয়ে যাচ্ছে।

বন ও বন্যপ্রাণী পরিস্থিতি ঃ

একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকায় ছিল বনাঞ্চল মানুষ বিশ্বাস করতো এই বিশাল বনভূমি কখনও উজার হবে না। কিন্তু নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে বনভূমি এমনভাবেই উজার হয়েছে যে, পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্য চরম হুমকির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ বন হচ্ছে একটি দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রধান উপায় ও জীববৈচিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ, অগনিত জীব প্রজাতির আশ্রয়স্থল, বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন দেশের মোট এলাকার অন্তত ২৫ শতাংশ বন বা গাছ পালায় আচ্ছাদিত থাকা প্রয়োজন। বহুজাতিক সাহায্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের মোট ৭৬৯,০০০ হেক্টর অর্থ্যাৎ মাত্র ৬ শতাংশ বনাঞ্চল রয়েছে তবে বন বিভাগের হিসাব অনুসারে দেশে এমন বন এলাকার পরিমান ১১ লক্ষ হেক্টর অর্থ্যাৎ ৭.৭ শতাংশ এলাকা বনভূমি বা গাছে আচ্ছাদিত। পরিমান গত এই পার্থক্য যাই হোক না কেন পরিমানটি প্রয়োজনীয় ২৫ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। ইউ. এস. এইড ও সিডার এবং সমীক্ষায় দেখা যায় দেশের ৫০ শতাংশ বন এলাকা ধ্বংস হয়েছে গত ২০ বছরে। গত ৫ বৎসরে বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, রংপুর, ও দিনাজপুর জেলায় যথেষ্ট গাছ কাটার ফলে বন পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। ত্রিশ বছর আগে টাঙ্গাইলে বন এলাকা ছিল ২,০০০ একর, অথচ বর্তমানে তা ১,০০০ একরেরও কমে নেমে এসেছে। একই ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বন এলাকায়ও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে জুম চাষের কারণে। অথচ এই সকল বনাঞ্চলে একসময় চিতাবাঘ, ভালুক, হরিণ, শিয়াল, বনমোরগ, হাতি, গুইসাপ, ঈগল, মেছো বাঘ, বানর ও অন্যান্য বন্য প্রাণী প্রচুর পরিমান পাওয়া যেত অথচ তা বন উজাড় হওয়ার সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বন্যপ্রাণীর বিচরণ বা বাসস্থল বিনষ্ট হয়ে যাওয়াকেই উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও এদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানের ব্যাপারে জনগণের সচেতনতার অভাব, বনবিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, শিকারী নিধন, বন্য প্রাণীদের প্রতি নির্মম নিষ্ঠুরতা এবং হৃদয়হীনা ব্যবসায়িদের অবৈধ রপ্তানী কার্যক্রম ইত্যাদি। একাধিক প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ আইনের অভাব ও অন্যদিকে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান আইনের প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনীহা, পরিস্থিতিকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ) আইন ঃ ১৯৭৩

বাংলাদেশ সরকার বন্য প্রাণী রক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিধান রেখে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ) আইন ১৯৭৩ প্রণয়ন করেছে। পূর্বেও বন্য প্রাণী সংরক্ষণে বিভিন্ন আইন ছিল যেমন, হাতি সংরক্ষণ আইন ১৮৭৯, বন্য পাখি এবং জীবজন্তু রক্ষণ আইন ১৯১২, যদিও গন্ডার সংরক্ষণ আইন

১৯৩২ বাতিল করা হয়েছে। তবুও পূর্ববর্তী আইনের অনেক ধারাগুলো প্রয়োজন মাফিক নতুন আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। বন্য প্রাণী সংক্রান্ত আইনে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেমন, পশু শিকার, মাছ ধরা, বন্য প্রাণীর জন্য অভয়ারন্য ঘোষণা, জাতীয় পার্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। আইনের এই বিধান গুলির বাস্তবায়নের জন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ) আইনের প্রধান ধারা গুলি সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

১। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে প্রথম তপসিলে বর্ণিত হয়েছে কোন কোন বন্য প্রাণী শিকার করা যাবে।

২। দ্বিতীয় তপসিলে বর্ণিত হয়েছিল কোন কোন প্রাণী সংরক্ষিত হিসাবে শিকার করা যাবে না। তবে শিকারের অনুমতি সরকারের কাছে সংরক্ষিত থাকে।

৩। তৃতীয় তপসিলে বর্ণিত হয়েছে কোন কোন বন্য প্রাণী শিকার করা যাবে না।

তবে সর্ব শেষ ঘোষণা অনুসারে বর্তমানে কিছু কিছু বন্য প্রাণী শিকার হত্যা বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। যেমন ঃ-

৪। বর্তমানে ক্রীড়া প্রাণী হিসাবে বন্য প্রাণী শিকার করা, হত্যা করা বা ধরা যাবে না। তবে শর্তসাপেক্ষে সরকার এর অনুমতি সংরক্ষণ করে।

৫। এই আদেশের সুস্পষ্ট ভাবে অন্য কোন ব্যতিক্রম না থাকলে "সংরক্ষিত প্রাণী" হিসাবে বর্ণিত বন্য প্রাণী শিকার করা, হত্যা করা বা ধরা যাবে না।

৬। কোন ব্যক্তি ব্যবসা, বাণিজ্য বা জীবিকা হিসেবে বন্য প্রাণী বিক্রয় করবে না, বা স্মরক হিসেবে বা মাংসহিসেবে বা স্মারক চিহ্ন বা মাংস থেকে কোন বস্তু বা দ্রব্য প্রস্তুত করবে না যদি তার কাছে এ সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে জারিকৃত কোন বৈধ অনুমোদন পত্র না থাকে।

৭। সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন এলাকাকে বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।

৮। সরকার যে কোন এলাকাকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য অথবা জাতীয় উদ্যানের উন্নয়নের অথবা প্রাকৃতিক নান্দনিক দৃশ্যাবলী উপভোগ অথবা অন্য কোন রকম ব্যতিক্রমধর্মী কারণে উপরে বর্ণিত যে কোন বা সকল বিধি নিষেধ সরকার শিথিল করতে পারবে।

ধারা-২৩ (২) ঃ বর্ণিত হয়েছে কোন ব্যক্তি কোন অভয়ারন্য গাছ পালার ক্ষতি বা ধ্বংস করতে পারবে না, কোন ব্যক্তি অভয়ারন্যে আগুন লাগাতে পারবে না, বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য বা এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত পানি কুলষিত করতে পারবে না, বন্য প্রাণী বসবাসের স্থানে জমি চাষ করবে না, বিদেশী প্রাণী বা গৃহ পালিত প্রাণী প্রবেশ করাইবে না। ধারা ২৩ (৩) বর্ণিত হয়েছে যে, জাতীয় উদ্যান এবং ইহার চারদিকের সীমানা হইতে এক মাইলের মধ্যে কোন বন্য প্রাণী শিকার, হত্যা বা ধরা যাবে না।

বন্দুকের গুলি ছোড়া বা বন্য প্রাণী বিরক্ত করা বা বন্য প্রাণীর প্রজননে হস্তক্ষেপ করা, গাছ কাটা ইত্যাদির অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে কেউ যদি এই আইন ভংগ করে তার শাস্তি ৬ মাস কারাবাস বা ৫০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে, যদিও এর প্রয়োগ খুব একটা চোখে পরে না।

বন্য প্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণ আমাদের দায়িত্ব ঃ

১। গণ সচেতনতা বৃদ্ধি।

২। বন্য প্রাণী ও পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের আরো বেশি লোকবল নিয়োগ করা।

৩। কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগ কারী প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি কর্মতৎপর হওয়া।

৪। সরকারের উচিৎ, শাস্তির বিধান ও জরিমানার জন্য আরো কঠোর নীতি বা বিধান তৈয়ার করা।

৫। জাতীয় প্রচার মাধ্যমে এই সংক্রান্তনীতি প্রচার করা।

৬। পরিবেশ রক্ষায় ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণে যারা নিয়োজিত রয়েছে, তাদেরকে আরো উন্নত প্রশিক্ষন ও উপকরণ সরবরাহ করা।

৭। পরিবেশ রক্ষা ও বন্য প্রাণী সংক্ষণে সরকারী আরো টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ।

৮। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ আরো যুগপোযোগী করা।

৯। প্রতিবেশী দেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান, ও বার্মা, যেখানে পরিবেশ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণে তাদের সরকার সুমান অর্জন করেছে, তাদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও তাদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

তথ্য সূত্রঃ

১। বন সম্পদ ও পশু বিষয় আইন (২০০৮); সম্পাদনায় -মুহাম্মদ সাইফুল আলম; বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী

২। বাংলাদেশ পরিবেশ চিত্র (১৪০৬); সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরী; বাংলাদেশ সংবাদিক ফোরাম; সহযোগিতা পরিবেশ বনমন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার ও জাতি সংঘ উন্নয়ন কর্মসুচী (ইউ, ত্রন, ডি পি)

৩। পরিবেশ ও আমাদের অস্তিত্ব (২০০৯); সম্পাদনায়- ড. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম; প্রকাশনায়- নর্দান ইউনিভার্সিটি এনভাইরনমেন্টাল ক্লাব।

৪। বাংলাদেশ বন্য প্রানী (সংরক্ষন) আদেশ-১৯৭৩

৫। পরিবেশ ও আমাদের ভবিষ্যৎ (২০০৮); সম্পাদনায়- ড. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম; প্রকাশনায়- নর্দান ইউনিভার্সিটি এনভাইরনমেন্টাল ক্লাব।

জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঃ আজকের ভাবনা ও করণীয়

ড. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম*

মানুষের অনভিপ্রেত কাজকর্ম, শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণ। যার ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি গ্যাসের নিঃসরণ বেশী মাত্রায় হয়। যা ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে প্রতিনিয়ত। এর পরিনাম একঃ পর্বত ও হিমাবাহ গলতে শুরু করছে যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহুলাংশ তলিয়ে যাবে। মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ হল তাদের অন্যতম। দুইঃ আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। ফলে খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড় ও বন্যায় বিপর্যস্ত হবে আমাদের পৃথিবী তিনঃ বায়ুমন্ডলের ওজনস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হবে ফলে জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হবে।

আজ পরিবেশ সমস্যা সাড়া বিশ্ব জুড়ে আলোচিত। কারন পরিবেশ বিপন্ন হলে এর প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করার জন্য উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন হয় না। যদিও পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য ব্যাপক গবেষনার প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে পরিবেশকে বিপন্ন করার পিছনে বাংলাদেশের ভূমিকা খুব একটা না থাকলেও চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ২০০৭ সালে, আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জার্মানওয়াচ (Germanwatch) আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুকিপূর্ণ দেশগুলোর একটা তালিকা তৈরী করেছেন। যার প্রথম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। গত দুইতিন বছরে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (সিডর, বিজলী, আইলা) বাংলাদেশের জন্য প্রথম স্থান নির্ধারনে বেশ ভূমিকা পালন করে বলে সংস্থার বিশেজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন (নিচের সারণী-১ দ্রষ্টব্য)। ১৯৯৮ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থানে ছিল গড়ে দ্বিতীয়।

স্থান (২০০৭)	দেশ
১	বাংলাদেশ
২	উত্তর কোরিয়া
৩	নিকারাওয়া
৪	ওমান
৫	পাকিস্থান
৬	উলিভিয়া
৭	পাপোয়া নিউগোনিয়া
৮	ভিয়েতনাম
৯	গ্রিস
১০	তাজাকিস্তান

Source: The Daily Star: 05/12/2008

আরো চিন্তিত হই যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম শুরু হয় জীববৈচিত্রের বিলুপ্তি নিয়ে। দুই বছর পূর্বে (১৭/০৪/০৮) সমকাল পত্রিকায় একটি শিরোনাম হয়েছিল – "বিলুপ্তির পথে দেশের দেড়শ প্রজাতির বন্যপ্রাণী"। ঐ একই প্রবন্ধে ডব্লিউটিবির তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৯০৩ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর মধ্যে ৩০-৩৫ টি উভচর ১২৬ টি সরীসৃপ, ৬৫০ টি পাখি এবং ১১৩ টি স্তন্যপায়ী প্রজাতির কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে ১০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রানীদের বিলুপ্তি হয়েছে আর ৪৩ টি বিলুপ্তির

* সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।
এবং প্রতিষ্ঠাতা ও কনভেনর; নর্দান ইউনিভার্সিটি এনভাইরনমেন্টাল ক্লাব

পথে। আর বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে লজ্জাবতী বানর, গেছোবাঘ, উদবিড়াল, শুশুক, বনছাগল, বনরুই, মুখপোড়া হনুমান, বনবিড়াল, মেছোবাঘ, কাকড়াভুক বেজী, ভোঁদড়, কালু বালুক, বাগডাস এবং মায়া হরিন। চিন্তার বিষয় বৈকি, মাছে ভাতে বাঙ্গালী যখন সংবাদ শিরোনামে দেখবে, "চুয়ান্ন প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির পথে", 'মাছশূন্য ব্রহ্মপুত্র' ইত্যাদি। এই চিন্তা উপলব্দিতে সাহায্য করবে আমাদের অস্তিত্বের জন্য জীববৈচিত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে, সচেতননা বৃদ্ধিতে, নিজ ও অন্যকে জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব যেন বিপন্ন না হয় তার জন্য কিছু করার তাগিদে। কারণ বিজ্ঞানীরা যদিও বিলুপ্তির কারণ একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করেন, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার চেয়ে মুনুষ্যসৃষ্ট কারনে প্রজাতির বিলোপসাধন প্রাকৃতিক বিলোপ সাধনের চেয়ে ১০০ থেকে ১০০০ গুন বেশী (পরিবেশ পত্রঃ April-June 2006)। সাধারণ হিসাবে মানুষের বসবাসের এলাকার ভূমি, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য অবকাঠামোর গড় বিবেচনা করলে দেখো যায় - ৫০ কিলোমিটার জুড়ে প্রত্যেক এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ২৫.৫% এবং বৈশ্বিক মাপকাঠিতে ১৬.৩% এর ভেতরে ৯.৯% জীবপ্রজাতিভূক্ত এলাকা এই অঞ্চলগুলি ধারণ করে কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদির চাহিদা মেটানোর ফলে এ অনুপাত নিয়ন্ত্রেনে রাখা কোন কোন দেশের পক্ষে সম্ভব হলেও ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে অসম্ভব। আর তাইতো আমাদের টিকে থাকার জন্যই বেশী মেধা, শ্রম দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, সহবস্থানের ধারনা নিয়ে নিজেদের স্বার্থেই।

আজকের এ প্রবন্ধে বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত কিংবা বিলুপ্তির পথে এ রকম কিছু প্রাণী নিয়ে আলোকপাত করাই উদ্দেশ্য। প্রাণী নির্বাচনে দুইটি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ গ্রামে বসবাস করার সুবাধে যে সকল প্রাণীগুলোকে আমি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু এখন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না, সেসব থেকে কয়েকটি, দ্বিতীয়তঃ যে সকল প্রাণী সারা দেশেই পরিচিত, সে সব থেকে কয়েকটি। বর্তমান জীববৈচিত্র্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাই আমার প্রবন্ধের আসল উদ্দেশ্য।

শেয়াল

কয়েক বছর পূর্বেও শেয়াল দেখতে পাওয়া যেত না এমন জায়গা ছিল বিরল। গ্রামে বাস করার সুবাদে শেয়ালের চিৎকারে ঘুমানই ছিল একটি কঠিন কাজ। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের চত্বরের ভিতরেও ১৯৮৮-১৯৯২ সাল পর্যন্ত গুটি কয়েক শিয়াল দেখেছিলাম। সামান্য ঝোপঝাড়, গোরস্থান শেয়ালদের বাস করার জন্য যথেষ্ট।

শেয়াল নিশাচর প্রাণী। ছোট দলবদ্ধ হয়ে থাকতে পছন্দ করে এবং Leadership মেনে চলে। জীবন্ত প্রাণী ধরে খাওয়াই শেয়ালের স্বভাব। জ্যান্ত কিছু না পেলে মৃতবস্তু পেলে তাই গোগ্রাসে সাবাড় করবে। জ্যান্ত প্রাণীর মধ্যে ঘাস ফড়িং, কাকড়া, মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি, ইঁদুর অন্যতম। আখের রস, কাঠাল, গাবও শেয়ালের খাবারের মধ্যে অন্যতম। বাসাবাড়ী থেকে হাঁস, মুরগী ও ছাগল ছানাও প্রায়-ই শেয়ালদের খাবার লিষ্টে চলে আসতো। শেয়াল অনেক কীট ভক্ষণ করে আমাদের পরম উপকারও করে থাকে। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের এলাকায় শেয়াল দেখা যাচ্ছে না। যে সকল কারনে শেয়ালের অস্তিত্ব লোপ পাচ্ছে তা হল-

প্রথমতঃ আবাসন সৃষ্টির লক্ষে গ্রামের ঝোপঝাড় উজাড় হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে। যেহেতু মৃত জীবজন্তুও শেয়ালের অন্যতম খাবার। বিষাক্ত মৃত জন্তু-জানোয়ার ভক্ষণের ফলেও মারা পড়ছে শেয়াল।

তৃতীয়তঃ চামড়া ও শিয়ালের মাংস বিভিন্ন ঔষধে ব্যবহার করার জন্যও মারা পড়ছে শেয়ালের দল।

খেঁক শিয়াল

খেঁক শিয়াল বা ইন্ডিয়ান ফক্স একটি বড় পোষা বেড়াল আকারের দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা

এবং ওজনে দুই থেকে তিন সের ওজনের প্রাণী। ওদের লেজ প্রায় এক ফুটের মত। এরা শিয়ালের চেয়ে কম হিংস্র। ইদুর, টিকটিকি, রক্তচোষা, কীটপতঙ্গ, কাঁকড়া এদের প্রিয় খাবার। ফুটি, তরমুজ, খিরা, বরই ছোলা ও ছোলার পাতা এদের খুবই প্রিয়।

ড. মোঃ আলী রেজাখান তার বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী প্রবন্ধে – কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ধরে ৩৮ কি. মি. দক্ষিনে ইনোনীতে বন বিভাগের বিশ্রামাগারের পেছনে কেয়া ঝোপে খেক শিয়াল দেখার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। এও উল্লেখ করেছেন, ১৯৯৫ সালের জুলাইতে তিনি ওদের আর দেখতে পাননি। মানুষ ও প্রাণীসহ এদের অজস্র শত্রু রয়েছে। খেঁক শিয়াল যেহেতু পোষা পাখি ও প্রাণীর ক্ষতি করে না উপরন্তু ইঁদুর ও কাঁকড়া খায় সেহেতু খেক শিয়াল উপকারী প্রাণী হিসাবেই পরিচিত।

উড়ন্ত খেঁকশিয়াল

উড়ন্ত খেঁকশিয়ালের অস্তিত্ব বাংলাদেশে আছে বলে প্রমানিত হয়নি। এরা সাধারণত এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনগুলতে বাস করে। এদের পাখাগুলো প্রায় দেড়মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। মালয়েশিয়ায় এদের বিপুল পরিমানে পাওয়া যায়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফলখেকো এই খেঁকশিয়াল সাধারণত ফল খায়, মধু পান করে এবং বীজগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে পরাগায়নে এবং নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। কোনো কোনো উড়ন্ত খেঁকশিয়াল খাবারের সন্ধানে প্রায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে থাকে। থাইল্যান্ডে উড়ন্ত খেঁকশিয়াল শিকার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মালোয়শিয়ায় প্রতিবছর আনগত ভাবে ২২ হাজার প্রাণী শিকার করা হয় আর বেআইনী করা হয় ঢেঢ় বেশী। এভাবে নিধন করতে থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে মালয়েশিয়া থেকে উড়ন্ত খেঁকশিয়ালের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারনা।

হরিন

বাংলাদেশে যে সকল হরিণ সচরাচর দেখা যায় তা হল – চিত্রা হরিণ, পারা হরিণ, সাম্বার, বারসিঙ্গা ও মায়া হরিন। এদের মধ্যে বারসিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। জামার্ন বিজ্ঞানী হেল্ডরিক যে আশির দশকে সুন্দরবনে এসেছিলেন তার অভিমতও তাই। কারণ ৭০-৯৫ সাল পর্যন্ত এদের সুন্দরবনে দেখা যায়নি। বারসিঙ্গা ছাড়া বাকী হরিণদের এখনও সুন্দরবনে দেখা মিলে। ১৯৯৬-৯৭ সালের এক জরিপ মতে, সুন্দরবনের হরিণের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ।

বিলুপ্তির কারণ

হরিণ শিকার সুন্দরবনের ব্যবসায়ীদের লাভজনক ব্যবসা। হরিণের গোস্ত সহজেই বিক্রি করা যায়। চামড়া উচ্চ মুল্যে বিক্রি হয়। মাথা ও শিং দিয়ে তৈরী করা হয় শোভাবর্ধক কারুপণ্য।

শিকারীরা রাতের বেলায় শক্তিশালী টর্চের আলো হরিনের চোখে ফেলে গুলী করে হত্যা করে। অনেক সময় হরিণ যে সব পাতা বেশী খায় সেগুলোতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশিয়ে মারা হয় হরিণ। কলার মধ্যে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে এবং ফাঁদের দ্বারাও হরিণ শিকারীরা হরিন শিকার করে থাকে। এই শিকারী চক্র এতটাই বেপরোয়া যে, তারা অনেক সময় হরিণ শিকারে বেঘাত সৃষ্টিকারী প্রহরীদেরকে হত্যা করে থাকে। হরিনের সংখ্যা কমে গেলে সুন্দরবনে ইকো ট্যুরিজম ব্যাহত হবে।

চড়ুই

কয়েক বছর আগেও আমাদের বাসার বারান্দায় প্রচুর সংখ্যক চড়ুই পাখির বাসা ছিল। মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে আটকা পড়তো আর চেয়ে চেয়ে দেখতাম তার ঘর হতে বের হওয়ার বেকুলতা। চড়ুই স্বভাবগতভাবেই মানুষকে ভয় করে কম। চড়ুই এর প্রাধান খাবার শস্যদানা। মাকড়সা, আরশোলা, ঘাসফড়িং মেরেও খেয়ে নেয়। উড়ন্ত পোকা ধরতে চড়ুই এর কোন জুড়ি নেই।

মাঝে মাঝে সবজী বাগানের কচি গাছ, কুঁড়ি, লতা গাছের ডগা খেয়ে সবজী বাগানের বেশ ক্ষতি সাধন করলেও আমাদের উপকারও কম করে না। যে সব কীট বা গুটি পোকা মাঠের পাকা ফসলের নানান ক্ষতি করে সেগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়, কারণ, সদ্যজাত বাচ্চারা নরম পোকা ছাড়া খেতে পারে না।

ধ্বংসের কারন সমূহঃ

১. খাদ্যের জন্য, সখ মোটানোর তাগিদে মানুষ বিভিন্ন পাখি শিকারসহ বনাঞ্চলগুলোকে বিনষ্ট করছে।

২. কীটনাশক প্রয়োগ করে সবজী চাষ করা, বীজতলা রক্ষা করার জন্য বিষ প্রয়োগ এ সবই চড়ুই ধ্বংসের প্রধান কারণ। যশোহরের ডাকাতিয়া গ্রামে ১৯৯৯ সালের ৩১ আগষ্ট কীটনাশকের কারণে একদিনে মারা যায় প্রায় ৫ হাজার চড়ুই।

৩. আধুনিক গবেষনার ফল হিসাবে দেখা গেছে, মোবাইল ফোন ব্যবহারে তার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ চড়ুই এর দেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে এরা ঘরে থাকতে পাড়ছেনা, যা বংশ বিস্তারকে ব্যাহত করছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে। গবেষণাটি করেছেন লন্ডনের রয়েল সোসাইটি ফর প্রোটেকশন আব বার্ডস।

শঙ্খচিল

শঙ্খচিলের ইংরেজী নাম Brahminy Kite এবং বৈজ্ঞানিক নাম Haliastur Indus। এদের সাধারণত নদীর পাড়ে বর্ষার ডুবে যাওয়া ধান ক্ষেতের আসে পাশে দেখা যায়। এক সময় দেশের সর্বত্রই শঙ্খচিল দেখা যেত। বর্তমানে এদের সংখ্যা দ্রুত কমে গিয়ে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে।

চিল গ্রামের প্রতিটি পুকুর বা জলাশয়ের ধারে হিজল, পিটালী, নারিকেল অথবা পুকুরের উপর দিয়ে উড়তে থাকে এবং মাছ দেখলে ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে খায়। এছাড়াও শঙ্খচিলের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ব্যঙ, ইঁদুর, মুরগীর বাচ্চা, পোকামাকড় ইত্যাদি। গ্রামে আমাদের দুয়ারে থেকেও ছোট বেলায় দেখেছি চিল কিভাবে মুরগীর বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

বিলুপ্তির কারন

১. নদী-নালা, হাওড়-বাওর সহ জলাভূমির ধ্বংস হওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া।
২. জলাশয় ভরাট করে আবাসন সৃষ্টিতে।
৩. নগরায়নের ফলে।

কচ্ছব

প্রায় বিশ বছর আগে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে কাঠ বাঁশের স্তোপের নীচে কয়েকটি কচ্ছপ দেখেছিলাম। সম্ভবত এর আগের সময়ে বর্ষার পানির সাথে এসে জায়গাটাকে আবাস স্থল হিসাবে নিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রায় সবর্ত্রই বিভিন্ন সাইজের কচ্ছব দেখা যেত। এখন অনেকটা দুলর্ভ। তবে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন সমুদ্র সৈকতে প্রচুর পরিমান কচ্ছব দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'অলিভ রিডলে' (Olive Ridley)। দুশ্চিন্তার বিষয় হল – ২০০৯ সালের শুরুতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রাকাশিত খবরে জানা যায় - শত শত কচ্ছব মারা পড়ছে ঐ এলাকায় যা চলতে থাকলে এর বিলুপ্তির ঘটনা পর্যন্ত ঘটতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। কচ্ছপ হ্রাসের কারণ সমূহঃ

১. মাদি কচ্ছবরা ডিম ছাঁড়তে উপকুলের দিকে আসতে যেয়ে জেলেদের জালে আটকা পড়ে এবং মাছ ধরার ট্রলারের সাথে আঘাতের কারণে কচ্ছব অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হচ্ছে।

২. মৎস আরোহনে জেলেদের আইন লঙ্ঘন এবং একই স্থানে অনবরত বেশী সংখ্যক যান্ত্রিক

ট্রলারের উপস্থিতি।

৩. নির্বিচারে বর্জ্য নিক্ষেপ।

৪. বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশী পানি সীমায় বিষাক্ত বর্জবাহী বিদেশী জাহাজের অনুপ্রবেশ।

৫. কচ্ছব ধ্বংসে দায়ী ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে।

৬. পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব। কারণ অনেকেরই ধারনা কচ্ছব মাছের ক্ষতি করে। কাজেই কচ্ছব ধ্বংসে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই।

বিভিন্ন প্রজাতির মাছ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর সবর্ত্রই বিভিন্ন রকমের প্রচুর পরিমান সুস্বাদু মাছ পাওয়া যেত। আফসোস পুকুরে মাছ চাষ না করলে মাছে-ভাতে বাঙ্গালীরা মাছ খেতে পারতো কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যেই অনেক জাতের মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। যা বর্তমানে পাওয়া যায় তা দুর্গন্ধযুক্ত ও বিপদজনক।

মাছ ধ্বংসের কারণ সমূহঃ

১. শিল্প কারখানার বর্জ্য নদীতে মিশে নদীর পানি বিষাক্ত করছে যা জলজ প্রাণীদের ধ্বংস করছে।

২. অতিরিক্ত মাছ শিকারের ফলে।

৩. অতিমাত্রায় বালু উত্তোলনের ফলে নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যহত হওয়ায়।

৪. গ্রীনহাইস এফেক্টের ফলে সমুদ্রসীমা বৃদ্ধি এবং এর ফলে লোনাপানি নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পানি লবনাক্ত করার ফলে।

৫. এছাড়া ডিম দেওয়ার সময় পরিবেশ দূষনের ফলে উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার ফলে

কুমির

সরীসৃপ প্রজাতির অর্ন্তভুক্ত মিঠাপানির কুমির দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র চিড়িয়াখানায় ও খান জাহান আলীর মাজারে এদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এখনও কয়েকটি জীবিত রয়েছে। লবনাক্ত পানির কুমির ও মেছো কুমির অতি বিপন্ন অবস্থায় টিকে আছে। বাংলাদেশের সুন্দবনে রয়েছে লবনাক্ত পানির কুমির। ১৯৮৫ সালের এক জরিপ মতে, বাংলাদেশ ১৫০ থেকে ২০০ লবনাক্ত পানির কুমির ছিল (ডেইলি স্টারঃ ১৭ এপ্রিল ২০১০) এখন তা আছে মাত্র কয়েকটি যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সুন্দরবনে প্রায় ৭০০০ কুমির বাস করার মত পরিবেশ রয়েছে।

বিলুপ্তির কারণঃ

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

২. নদীর নব্যতা হ্রাস

৩. কুমির নিধন

৪. জলবায়ু পরিবর্তন

৫. আবাস্থল ধ্বংস ও খাদ্যাভাব

৬. বন্যপ্রানী সংরক্ষণ অধ্যাদেশ (১৯৭৪) এর সঠিক বাস্তবায়নের অভাব।

করনীয়

কৃত্রিম ভাবে বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে এদের রক্ষা করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের করমজলে একটি প্রজনন কেন্দ্র ২০০০ সাল থেকে কাজ করছে। এবং যথেষ্ট সফল হচ্ছে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারনা।

উল্লুক

পৃথিবীতে ৬২৫ প্রজাতির প্রাইমেট এর মধ্যে চারভাগের একভাগই আজ বিলুপ্তির পথে (আমার দেশ ১১/৪/০৫)। মানুষের পরই এদেশ উন্নত প্রাইমেট হল উল্লুক। পৃথিবীর মাত্র চারটি দেশে এখনো উল্লুক প্রজাতির (হলফ গিবন) বেঁচে আছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। বাংলাদেশের লাউয়াছরার ডব্লিউটির এর হিসাব অনুযায়ী ২০ বছর আগেও ওখানে প্রায় ৩০ হাজার উল্লুক ছিল, বর্তমানে যা নেমে এসেছে ২৮২ টিতে (বিজ্ঞান সাময়িকী: আগষ্ট ২০০৯)।

বিলুপ্তির কারন ঃ

১. প্রাইমেটদের আবাস ভূমিতে কৃষক ও কাঠুরিয়াদের কাঠ কেটে বন উজাড়।
২. ট্যুরিষ্ট স্পট নির্ধারন।
৩. ট্যুরিষ্টদের যানবাহনের হর্ণ ও মানুষের হৈচৈ এর ফলে অনুকূল পরিবেশ এর অভাব।
৪. এদের দেহের বিভিন্ন অংশ দিয়ে নানা ধরনের ঔষধ তৈরী।
৫. মানুষের সাথে এদের বিশ কিছু মিল থাকায় আমেরিকা ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে গবেষণার কাজও এদের বাংলাদেশ ও ভারত থেকে রপ্তানী করা হত। যা এদের সংখ্যা হ্রাসের প্রধান করণ। অবশ্য বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশই বর্তমানে উল্লুক রপ্তানী বন্ধ করেছেন।

বাঘ

বাঘ বিড়াল জাতীয় প্রানী। এর মধ্যে প্যানথেরা টিগরিস (Panthera tigris) অন্যতম যা রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে বেশী পরিচিত। এরা লম্বায় প্রায় ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। লেজ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ ইঞ্চি আর ওজন প্রায় ২৫০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ছোট বড় সকলেরই বাঘ দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে বেশ চিন্তার বিষয় এই যে, সুন্দর এই প্রাণীটি ক্রমেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে একশত বছর পূর্বে, সারা পৃথিবী জুড়ে এদের সংখ্যা বিশেষজ্ঞরা নির্ণয় করেছিলেন প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বর্তমানে যার সংখ্যা এসে দাড়িয়েছে মাত্র ৩,২০০ থেকে ৪০০০ (ডেইলি স্টারঃ ২৮/০১/০৯)

বিলুপ্ত হওয়ার কারনসমূহঃ

গুরুত্বের দিক থেকে মৃত বাঘকে জীবিত বাঘের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। আর এটাই বিড়াল প্রজাতি এই প্রাণিটির বড় অপরাধ। অনেক দেশেই বিশেষ করে; চীনারা বিড়াল প্রাজাতি প্রানীর অংশ দিয়ে অতি মূল্যবান ঔষধ তৈরী করতে সক্ষম। এবং এ সকল ঔষধ অত্যন্ত চড়া মূল্যে পশ্চিমা দেশগুলোতে পাচার হয়। বাঘের হাড় ও চর্বি দিয়ে বাত রোগের ঔষধ তৈরী হয়। বাঘের গোঁফ থেকে মানুষকে অধিক বলবান এবং শক্তিশালী করার ঔষধ তৈরী হয়। বাঘের ছোখ দিয়ে অতিমূল্যবান বড়ি তৈরী হয় যা শরীরকে যে কোন মারাত্মক বির্পযয় থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। তাইওয়ান, জার্মান, কোরিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা অধিকতর যৌনশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য বাঘের পুরুষাঙ্গের তৈরী এক কাপ স্যুপের জন্য কমপক্ষে ৩৫০ মার্কিন ডলার ব্যয় করেন। বাঘের রক্ত থেকে উন্নতমানের মদ তৈরী হয়। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ব্যঘ্র-নির্জাস থেকে ঔষধ প্রস্তুতের জন্য একমাত্র চীনেই বছরে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বাঘের চাহিদা রয়েছে। গৃহসজ্জার কাজেও বাঘের চামড়ার বেশ কদর রয়েছে।

যদিও কেউ কেউ কিংবা অনেকেই বন্যপ্রাণী সংগ্রহশালার স্বপক্ষে যুক্তি দেখান। কিন্তু এই সংগ্রহশালার উদ্যোগ বাড়ার সাথে সাথে সারা বিশ্বব্যাপী প্রাণী কেনা বেচার পরিমানও বেড়ে গেছে অবিশাস্য ভাবে। যা প্রাণী বিলুপ্তির অন্যতম কারন। কেননা যারা বন্যপ্রাণী শিকার করে পাচার বা বিক্রয় করেন তারা অনেকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। Dead or alive এটাই তাদের শ্লোগান।

বাঘের প্রধান খাদ্য তালিকায় রয়েছে, শুকর, হরিন, মহিষ এবং অ্যানটিলোপ। বিভিন্ন কারনে বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানুষ কর্তৃক নির্বিচারে শিকার ইত্যাদির কারণে যখন মাঘের খাবার সমস্যা দেখা দেয় তখন বাঘ মানুষকেও আক্রমন করেন। ফলে মানুষ আত্মরক্ষার খাতিরেও বিপুল সংখ্যক বাঘ শিকার করেছেন বা করছেন বলে প্রতিনিয়তই খবরে স্থান পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঝড়, জলোচ্ছাসের এর ফলে বিপুল পরিমান প্রাণীর অপমৃত্যু হয়ে থাকে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের উপর বাহিত সিডর এর তান্ডবে সুন্দরবন ও তার মধ্যে বসবাসরত জীববৈচিত্র্যর বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে। অনেক জীবজন্তুর মৃতদেহ পানিতে ভেসে থাকতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অথবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ পরিবেশনে।

রক্ষার উপায়ঃ

বাঘের আবাসস্থলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাথে যে জটিল এবং সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ভারসাম্য রয়েছে তাকে অবশ্যই সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষনার ও বিজ্ঞজনের উপর ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন। আশার বানী হচ্ছে, বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন মন্ত্রানালয় ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য বাঘ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

যে সকল অঞ্চলে বাঘের আবাস্থল হিসাবে পরিচিত সে সব অঞ্চলগুলোকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষনা দেওয়া এবং নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগ করা। তবে প্রতিরোধের ব্যবস্থাই বেশী প্রয়োজন।

আই ইউ সি এন এর বাঘ বিশেষজ্ঞ পিটার জ্যাকসন ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটানসহ অকেগুলি দেশ ভ্রমন করে মতামত দিয়েছিলেন যে বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলে পর্যটনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে পর্যটকদের সমাগম সৃষ্টি না করা হলে সে সকল সংরক্ষিত অঞ্চল হবে চোরাই শিকারীদের স্বর্গভূমি। তাই বন্য প্রানী সংরক্ষনে চাই বনব্যবস্থাপনা ও পর্যটন শিল্পের যথাযথ সমন্বয় সাধন।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বেশ আগ্রহী বলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ কর্তৃক অভিনন্দিত। বাংলাদেশ পরিবেশ সংক্রান্ত অনেক চুক্তি, কনভেনশন ও প্রটোকলে অন্যতম স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বন্যপ্রাণীআইনও রয়েছে, তবে অজ্ঞতার কারনে ফলপ্রসু খুব একটা হচ্ছেনা। প্রকৃতপক্ষে ৯০% লোকই জানেনা বন্যপ্রানী সংরক্ষন আইন রয়েছে কাজেই সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নিম্নবর্নিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে যে হারে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হচ্ছে তা অনেকাংশেই রোধ করা সম্ভব।

এক. বাংলাদেশে যে সকল উপজাতী বনের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের টেকসই বনায়নের মাধ্যমে জীবন রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপায় বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২০০৯ সালে কুইন্সল্যান্ডের একটি পার্ককে উপজাতীদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়।

দুই. জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে একযোগে কাজ করতে হবে বিশ্ববাসীদের, জলবায়ুর পরিবর্তন কিভাবে মৎসকুলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা বিজ্ঞানীরা Shrinking effect দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এ এফেক্টের কারণে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সামুদ্রিক জীবদের সাইজ ছোট হয়, কম ডিম দেয় এবং শেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যা সরাসরি জলাবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ুর পরিবর্তনে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্মুক্ষীন হলেও বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আসলে মানুষই এজন্য দায়ী। তাসমানিয়ার প্রাণীকুল নিয়ে গবেষনার পর বিজ্ঞারীরা এ ধারনা দেন। বিজ্ঞানীরা গবেষনা করে দেখেছেন তাসমানিয়ার জলবায়ু ছিল খুবই স্থির (stable) কিন্তু তারপর মানুষ বসবাস শুরু করেন তখনই বিদায় নিতে থাকে বৃহৎপ্রাণীকুল তাই মানুষকেই সচেতন হতে হবে সবার আগে (মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী)।

তিন. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলেও ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। শিল্প-কারখানা, রেডিও তরঙ্গ, মোটরগাড়ি, পারমানবিক ও রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার ও তাদের তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদির ফলে ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র। একবিংশ শতাব্দীর তাই বিজ্ঞানের বড় লক্ষ হওয়া চাই টেকসই, জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করার ও জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকানোর প্রযুক্তি আবিস্কার ও ব্যবহার করার সুযোগ করে দেওয়া।

চার. জীববৈচিত্র্যকে চির বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে জানতে ও বুঝতে হবে কি কারণে জীববৈচিত্র্য বাড়ে এবং কি কারণে কমে। এক একটি ইকোসিস্টেমের বিশেষ ধরনের পরিবেশকে আশ্রয় করে ঘনিষ্ঠ পারস্পারিকতার মধ্যে বাস করে অনেক প্রজাতি। এদের মধ্যে বহু ধরনের প্রতিযোগিতা সহপ্রতিযোগীতার মাধ্যমেই গড়ে উঠে জীববৈচিত্র্য সহ-অবস্থান করার ভারসাম্য। এই ভারসাম্য আবার সরল প্রকৃতির নয় বরং বেশ জটিল। আর তাই জীববৈচিত্রকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজন এই, ভারসাম্যকে বোঝা ও তার ভিত্তিতে সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

পাচঁ. ব্যানার, প্লেকার্ডসহ লংমার্চ করার সাথে সাথে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং যার যার অবস্থান থেকে যার যতটুকু করনীয় তা সামর্থ্য অনুযায়ী করতে হবে।

ছয়. এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রতি বছরে আমাদের দেশে ১% হারে আবাদী জমির সংখ্যা কমছে। অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আবাসস্থলের পরিমানও কমছে। জমির কমার কারণসমূহ হল-

ক. পৌর শহর ও নগরায়নের কারণে

খ. ভৌত অবকাঠামোগত কারণে যেমন- গ্রামীন রাস্তার তৈরী, বাজার, নতুন সরকারী অফিস স্থাপন ইত্যাদি।

গ. গৃহায়নের কারনে।

ঘ. নদী ভাঙ্গনে ইত্যাদি।

জমির পরিমান কমা আমরা পুরোপুরি রোধ করতে পারবো না সত্য। তবে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জমির সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি রোধ করা সম্ভব।

সাত. বাংলাদেশে বনায়ন সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় বিদেশী বর্ধণশীল বৃক্ষ যা স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি স্বরূপ কারণ এখানে অভিযোজন এর ব্যপারটি রয়েছে। বিভিন্ন প্রাণী ও পাখি বিশারদদের অভিমত; দেশজ জীবের উপযোগী বৃক্ষরোপন করতে হবে যেন জীববৈচিত্র্য টিকে থাকতে পারে।

আট. অনেক বিদেশী সংস্থা বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। যা বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষেই হয়ে থাকে। কিন্তু যথাযথ তদারকির অভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষার চেয়ে হুমকির সম্মুক্ষীন-ই হয় বেশী। সম্প্রতি ভোরের ডাক (১৮/১২/২০০৯) পত্রিকায় এ রকম একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকার একটি সংস্থা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে বনাঞ্চল ধ্বংস, অবাধে বৃক্ষনিধন ও পাচারের অভিযোগ উঠেছে। যা সত্যিকার অর্থেই চিন্তার বিষয়। তাই এ সকল ক্ষেত্রে সরকারী তদারকি বাড়াতে হবে।

দশ. বন্যপ্রাণী সংরক্ষনে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে রাজনৈতিক সদিচ্ছাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে পরিবেশবিদদের ধারনা।

এগার. রাজনৈতিক কিংবা কুটণৈতিক ভূল সিদ্ধান্ত, চুক্তি কিংবা সমঝোতার কারণে জীববৈচিত্র ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের প্যানেল তৈরী করে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুক্তি করা বাঞ্চনীয়।

সুত্রঃ

১. দৈনিক ইনকিলাবঃ ২৭/০৯/০৯

২. পরিবেশ পত্রঃ বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩; ২০০১ পৃ - ৩০-৩২

৩. মাসিক মদিনাঃ এপ্রিল ২০০৯

৪. মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী আগষ্ট ২০০৯, পৃ – ৪১

৫. ডেইলি স্টার, আগষ্ট ৭, ২০০৯।

৬. উইকেন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নভেম্বর ৬, ২০০৯, পৃ - ৮-৯।

৭. প্রথম আলোঃ ৩১/০১/১০

৮. আক্তারুজ্জামান কামাল (১৯৯৫); প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ-৫; সচিত্র বাংলাদেশ, ৩০ ডিসেম্বর পৃঃ ৩৪-৪২।

৯. আমার দেশঃ ২৭ আগষ্ট ২০০৯ পৃ. ৫।

১০. The Dail Star: 28/10/09

১১. দৈনিক ইনকিলাবঃ ২৭/০৯/০৯

১২. Rafiqul Islam (2010); River Halda in Chittagong to lose its fish resources over next two decades; Dhaka Courier; 12 March, P - 17.

১৩. পান্থ রহমান (২০০৯); টিকে থাকুক লর্ডরাদড়া অরণ্যের জীববৈচিত্র; মাসিক মদিনা; আগষ্ট ২০০৯ পৃঃ ১৮-২১।

১৪. Julfikar Ali Manki (2009); Life in the beautiful jungle; The Star; Vol-13, Issue 622, April 17, P-16-19.

১৫. প্রথম আলোঃ ৩১/০১/১০

১৬. Weekend Indipendent; 6 Nov 2009 P-8-9

১৭. The Daily Star 21/7/09

১৮. তুষার কান্তি গলুই (২০০৯); চড়ুই - এক বিপন্ন ঘরোয়া পাখি; বিজ্ঞান সাময়িকীঃ এপ্রিল; পৃষ্ঠা ৪০-৪২।

শান্তি

-ম. মীজানুর রহমান *

[নিসর্গের নিত্য বিমল আনন্দের ঐক্যতান আমাদের হৃদয়কে যে মানবিক উৎফুল্লতায় অবগাহিত করে তার উত্তরজীবন বড় অমলিন। এই যে আনন্দের উৎকর্ষতা এর পেছনে রয়েছে অমোঘ যুক্তির অবতারণা আর যা কিছু নৈসর্গিক ঘটনা প্রবাহ ঘটে যাচ্ছে তার পিছনে রয়েছে যথার্থ সংগত কারণ।
-জি এফ লেবনিজ]

স্বকপোলকল্পিত নানা মতবাদের দ্বন্দে মানুষ যখন নিত্যই
তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে সংঘর্ষে লিপ্ত
তখন আমি আমার হৃদয়াবেগ সকলি উজাড় করে বলি বৃক্ষের কথা
আর নির্বিকার নিসর্গের সকল সুন্দরের কথা

বৃক্ষরা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত নয় কখনো
ওদের মূক শব্দাবলীর সমারোহে
আপ্লুত হৃদয় আমার উল্লসিত হয়ে বলে ওরা আমারই মিত্র

ওরা বলে না যুদ্ধের কথা
বলে না যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা
বলে না, আমরা প্রস্তুত হচ্ছি যুদ্ধ করব বলে
এবং বলে না, যুদ্ধ করেই আমরা যুদ্ধের হাত পাকাচ্ছি

ওরা দেয় প্রেম
অমিয় আচরণের পরম উপহার
ওদের শব্দাবলী আমি শুনতে পাই
পুষ্পাবলীর অমৃত বর্ণে-গন্ধে
এবং ফলবতী হৃদয়ের ঐকতানে

যখন দেখি প্রজাপতি কিম্বা পাখিরা
এদিকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে
তখন আমার মনও উড়ে যায় ওদের সঙ্গে
এক অপূর্ব সঙ্গীতময়তায়

এই ঘৃণারহিত প্রেম আমাকে উদ্দীপ্ত করে
নিসর্গের অমোঘ চেতনায়
ওদের আচরণে আমি দেখতে পাইনা কোন মানুষের কূটকামিতা
তাই ফল ও ফুলের এই জীবনময়তায় আমি পাই স্বর্গের ভোগ
অপার শান্তি
তোমরাও এসো, আমার সঙ্গে হাত মেলাও
আমরা সকলেই এই নিসর্গের আশীস গ্রহণ করি
শান্তি লাভ করি – শান্তি

---

* বিশিষ্ট কবি

গাছ

ইসমাইল সৈয়দ জনী *

তৃপ্ত রোদে গাছের ছায়ায় শীতল করি প্রাণ
বাতাসেতে ছড়িয়ে পরে হরেক ফুলের ঘ্রান ।

নির্বিচারে কেটনা কেউ পরম বন্ধু গাছ
বেশী করে গাছ লাগিয়ে ঠেকাও সর্বনাশ
ফুল-ফল আসবাবপত্র সবই গাছের দান
অক্সিজেন দিয়ে সর্বক্ষন বাঁচায় সবার।

গাছ পালা সৃষ্টি কর্তার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত
অকারণে হয়না যেন তার খেয়ানত
এসো সবে সাধ্যমত বৃক্ষ রোপন করি
মনের মত রুচি সন্মত সবুজ বাংলা গড়ি ।

---

* কবি ও চারকুরীজীবি

জেগে উঠুক বাংলাদেশ

- মোঃ শফিকুর রহমান *

খেটে খাওয়া মানুষের
আজ পেটে নাই ভাত
গায়ের ঘাম ঝরে দিনরাত।

পরনে নেই জামা কাপড়
শীতের নাই কাঁথা কম্বল,
হারিয়ে গেছে সাহস শক্তি বল।

অসুখে নাই চিকিৎসা
পুষ্টিহীনতার চরম শিকার,
ব্যর্থসমাজ
প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে,
দেশ মাতৃকার হয়েছে ক্যান্সার,
মা কি বাঁচবে আর? সবাই নির্বিকার!

তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ
পদ্ম, মেঘনা যুমনা, কংশ,
নদীগুলি হয়ে গেছে ধ্বংস।

প্রতিবাদ নাই, কারো মাথা ব্যাথা নাই,
জেলে সম্প্রদায় টানছে ঘানি;
নদীতে নাই মাছ, মশা মাছি পচাঁ পানি।

এদেশ সবার, কোন শাসক গোষ্ঠীর নয়,
করো দৃপ্ত শপথ ঠেকাও বিপর্যয়
বন্ধ করে দাও রাঘবের থাবা
ক্যান্সার থেকে বাঁচাও দেশ,
জেগে উঠুক আবার বাংলাদেশ।

* বিশিষ্ট কবি

Part : II

[দ্বিতীয় পর্ব]

Giving Fundamental Rights to Natural Phenomenon

-Prof. Dr. M. Shamsul Haque*

Natural phenomenon such the rivers, forests and hills exist to maintain ecological balance besides being the source of water, marine and forest resources. The pressure of human habitation and commercial interests have been destroying those vital resources and making our planet un -habitable for the present and the future generations.

Over the last few months, the Daily Star and other newspapers along with some TV channels have been mounting pressure on the government to save rivers around Dhaka City Corporation from pollution and encroachment. Its latest report on vanishing forestlands in the Chittagong Hill Tracts is another incident of Wonton destruction of the ecosystem that sustains lives for human and animals in the area. Rivers have been polluted and shrunk to canals and canals have been filled up and forestlands have been grabbed by the people for personal benefits ignoring the facts that these natural elements are public goods and should be maintained in their original shape and character. Bangladesh is a small territory of 130,000 sq km and we have a huge population of 140 million and it is growing at about 2% a year.

Bangladesh has shown the worst kind of exploitation of rivers, forests and hills by grabbers of land and river banks and beds, forest lands and hills by illegal means by influential people. Such situation also exists in other countries also, may be of different types. For example I read an article on the Boston Globe of July 19, 2009 that people in some counties in Maine, USA were blocking a mineral water company Nestle from withdrawing water from the underground in a hilly area on the pretext of ground water level going down. Brazil put restrictions of similar kind to protect forest in the Amazon River basin. Arundhoti Roy, the famous Indian writer and social activist has been campaigning against building dam on some rivers in the southern areas of India. We can refer to the Kaptai Dam that has submerged huge area in the hill tract district affecting lives and property of the tribal people there just to generate some 160 mw of electricity in 1961/62. That was the beginning of the political unrest in that area which culminated in fighting for several years after Bangladesh came into being in 1971.

Earlier in 2006, the Nobel Prize winning economists J Stiglitz crisiticised the present system of National Income Accounting that does not account for the damage to environment while estimating GDP of a nation. By not adjusting for the costs of damage to the ecosystem the current GDP is overstated, and passing the burden of rebuilding on to the future generations. The whole issue of climate change is linked with this kind of destruction of natural environment starting from GHG emitted from the use of fossil fuel and methane from farmlands and cow dung. It is also

* Vice -Chancellor, Northern University Bangladesh.

known that paddy farming using irrigated water is also a source of methane gas emission.

Ecuador provided that kind of fundamental rights to its natural elements to maintain the ecosystem. The UN was considering the matter seriously. In Bangladesh we have seen some legal Activism by BELA and social activism by BAPA to protect rivers and forests of the country. Best example is to stop the construction work of a building by the DCC within Usmany Uddyan, called the lung of the old city. Protecting the banks of four rivers around Dhaka and cleaning project of the bed of Buriganga are other examples. As we know grabbing of rivers and forests lands is widespread all over the country. So BAPA has to form committees in all the places. We of course have a problem with our rivers as most of them originate upstream in India and Nepal. India has been diverting water in many places, such as Farrakka for irrigation and other purposes. So the issue becomes one of cross border protection by international bodies.

Given the acute nature of the crisis in Bangladesh, this writer is of the opinion that BELA, BAPA and others should organize a movement to get the Parliament pass and Act and include that in the constitution of Bangladesh so that people can sue for the protection of rivers, forests and hills whenever an act of violation takes place, just like violation of human rights. Unless such fundamental rights are granted by the constitution; powerful sections in the society will not stop destroying natural phenomenon and threaten the existence of human beings. Our law graduates from non- government universities can certainly be mobilized to play pioneering role in this respect. The objective will be to get fundamental right enshrined in the constitution by next year 2011 if not by the end of 2010.

Environmental change and Biodiversity in Bangladesh

-Motiur Rahman*

Generally our environment is controlled by its own system. This system plays by its surroundings ecosystem which maintain food chain and stability of environment. All the natural component such as plants and different animals are included in this environment. If a component of environment has lost or changed then whole environment can be collapsed. It is true that human is the main source to change the environment. Human socio-economic activities and others performance in nature tremendously pollute the nature and its impact on environment can reduce or destroy biodiversity[1]. Some reason of environmental change are mentioned bellow: First: Industrial waste and throwing chemical pesticide such as CFC, methane, painting chemicals etc. Second: Smoke from industry, Brick field and various vehicle. Third: Construct of dam and barrage.Fourth: Destruction of mangrove forest and trees of coastal area. Fifth: Hunting Tortoise ,corals , seagull and sea birds for human needs. Sixth: Absent of land use management. Seventh: Naval wastage and dumping oil. Eighth: Sedimentation of river and change of river stream.

Climate change impacts including higher temperatures, Ice melting, sea level rise, evapo-transpiration losses, enhanced monsoon precipitation and run-off, potentially reduced dry season precipitation, and increase in cyclone intensity would in fact reinforce many of these baseline stresses that already pose a serious impediment to the economic development of Bangladesh.

Fortunately, Bangladesh still has much amount of flora(plant) and fauna(Animals) because of it monsoon climatic condition. The amount of main species in Bangladesh are mentioned bellow. Flora(plant): Algae 6000,Moss type vegetation 400, Fern type vegetation 250, Zimnosprum 5, angiosperm 5000 and fauna(Animals) (see table-1).

Table-1: Statistics of Fauna of Bangladesh

Name of species	Total amount	Extinct	Critical endangered	Endangered	Vulnerable
Fish	708	0	12	29	17
Amphibious	22	0	-	3	5
Snake	126	1	13	28	27
Bird	628	2	19	20	8
Mammals	113	10	21	15	7
Total	1597	13	65	94	59

Source: IUCN, Bangladesh, 2003

* Researcher,Center for Analysis Research and Progress

[1] Biodiversity means the variability of different plants and animals in terrestrial, marine and other aquatic ecosystems.

SCENGEN estimates a global mean Temperature increase of 0.8 °C by 2030, 1.2 °C by 2050, and 2 °C by 2100 for the B2 scenario. If this happened then obviously a large number of species will be extinct. Hence this is the high time to take a better action plan to save our biodiversity. If we fail to do that then the whole ecosystem as well as environment in Bangladesh will be destroyed.

Action plan for save the biodiversity in Bangladesh.

According to the Legislation of 1992 government have taken some steps for protection biodiversity in Bangladesh.

1. *Preservation of natural environment, wildlife and extinction of forest* land for socio-economic development.
2. Including aforestation and plantation for all kind of development activities.
3. Inspire to use alternative woody furniture.
4. For enhancing acquired knowledge and exchange of experience to developed biodiversity, forest resource and wild life.
5. Disaster management and awareness of environmental development.
6. Control of throwing industrial pestiside,smoke and chemicals component.

Some recommendation:

1. Buildup a strong protection system for biodiversity.
2. Monitoring system must be improved to ensure better situations to the seven declared sanctuaries by the Government.
3. IIUCN has detected 24 flora as a extinct or becoming extinct species. Governnment have to take steps to protect them.
4. Government have to avoid foreign trees for any afforestation such as Ucliptus, Achacia etc.
5. Enhance public awareness for social a forestation.

Lake's Water Quality of Dhaka City: Alarm for Environment

-Md. Rezaul Rakib*

Dhaka is the capital city of Bangladesh and it is also called the Mega city. Accelerating growth of population in Dhaka city creates severe problems in residential and water sectors. The consumption of water is increasing day by day & the demand basically meeting by using the small water bodies and ground water partially. As a result the ground water level in Dhaka city is going down especially in summer season. On the other hand industrial waste materials, household waste materials and manufacturing waste are thrown in the small water bodies in Dhaka city. Due to this waste material, the water of this small water bodies pollutes. Severe water pollution affect on human life and also in the environment of Dhaka city. For the above-mentioned causes there need a study about spatial extent of water pollution, their impact on environment and recommendations of measures for prevention and recycling the polluted water for utilizing in future.

Water Bodies of Dhaka City

In Dhaka city we found mainly two types of water bodies-man made and natural. These have further been classified into (i) large water bodies (e.g., all natural water bodies including lakes/jheels and khals/channels) and (ii) small water bodies (e.g, man-made water bodies like ponds and enclosed *khals).* These water bodies again fall under a wide range of administrative jurisdictions. These are Forest Department, Public works, Animal husbandry, RAJUK, City Corporation, District Administration. At the same time, there are also water bodies under nongovernmental jurisdictions (individual ownership, group/ trust directed etc).

Lakes in Dhaka City

A lake is formed due to the collection of water in a natural basin and depression in a mountainous area or in plains. Sometimes, a stream may lead its water into these basin. As water is stored in a lake for a long time, the suspended impurities settle down. The quality of water depends on the seasons and flushing capacity of the lakes. Usually algae growths are found. Other organisms die a natural death when they do not get nutrition. During the rainy season, turbidity removal may be necessity. There are many lakes and small water bodies in and around of Dhaka city. Most of them are given bellow-

- Baridhara-Gulshan lake
- Cresent and Sangsad Bhaban lake
- Dhanmondi lake
- Gulshan-Banani lake
- Ramna Lake
- Uttara lake etc.

*** Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342.**

Description of Dhaka Lake's Water Quality

Bangladesh is a river based country and water is abundant here. But now a-days scarcity of pure water is an outstanding problem for the people. Polluted water is a factor of different pathogenic bacteria, which are the main sources for different diseases. So, we should know about various places water quality and should take proper steps to control water crisis. Present articles basically discussed Dhaka Lake's water quality. For this, the water samples were collected from different water bodies of different lakes of Dhaka city. Afterwards they were chemically analyzed and this was compared to the different "Standard relative weight age limit" for the potable water.

Temperature is basically an important factor for its effect on chemical and biological reaction in water. High temperature indicate the lower abundance of micro-organisms. The number of micro-organisms decreased with increasing temperature. In summer season our country's temperature increase. So, in the month of April-May lake's water micro organisms quantity decreases.and in the month of October-November the quantity of micro-organisms increases.

Odor is another important physical parameter of water for determining the quality of water. Various types of pollutants discharged into the water create obnoxious odor and harm the fish and other organisms by deteriorating the water quality of aquatic habitat. In different lake's water we get fishy odor.

Electric conductivity is another important physical parameter of water. When a number of ionic substance like sodium, potassium, magnesium, iron, etc. are released from industries then EC amount becomes high and this high amount of EC is not suitable for irrigation and aquatic life. In different years data analysis, it is noticed that the electric conductivity is varied from year to year. In Lake's water electric conductivity is very low than the standard value of fishing water and irrigation water.

TSS is another important physical parameter to determine the quality of water. Because TSS in water may cause bad odor, taste and also may promote conditions favorable for growth of pathogenic bacteria. The amount of TDS in organic and inorganic effluents and wastes discharged from industries may deteriorate the water quality and harm the aquatic habitat.

Dissolve Oxigen (DO) is probably the single most chemical parameter that is required to ensure the ecological health of receiving water. Fish killing, noxious taste, and odors and low biological diversity are often indicators of low DO in receiving water. According to BD standard amount of Dissolved oxygen should be least 6 mg/l. WHO standard is 6-8 and US and India standard suggest at least 6 mg/l. DO value is much more in Dhaka lake's water.

BOD_5 is an important water quality parameter for organic matter in water and empirical in nature. Excessive BOD_5 is harmful to aquatic flora & fauna like fish and micro-organisms. It is measured by the quantity of oxygen utilized by suitable aquatic micro-organisms during a five-day period. High BOD_5 can be indicative of organic pollution. The standard of BOD_5 in potable water is 0.2 in BD and 0 in WHO. So the water of the lakes are not fit for drinking. But the water can be used for aquatic fish culture, livestock watering and irrigation word.

Coliform group of bacteria is one of the most important microbial parameter for determining the quality of water. Coliform is an effective indicator of fecal pollution of water. But coli Colonise is much more higher than the standard value of Lake's water. Because urban sewerage pipe line linked with all these Lakes, which unclean lake's water. It' create more nitrogen and phosphorus. It also help to grow aquatic vegetation quickly. When all these vegetation dead then it unclean lake's water and at the same time it also increase the total amount of nitrogen, which is bad for aquatic life. According to US, BD, WHO, Indian standard the water of the lake can only be used as irrigation watering neither Drinking, live stock watering nor aquatic.

pH is an important chemical parameter for determining water quality. Water pH influences the other properties of water body, activity of organisms and potency of toxic substances presented in the aquatic environment. The very high and low pH is of water may cause irreversible damage to the aquatic environment. So analyzing all data it is shown that in lakes water pH value is within the standard value that means pH value is normal in lake's water of Dhaka city.

After all these chemical analysis we get the idea of our urban lake's present situation. This will help to develop social awareness and thus save many life's from unexpected death and irreparable injuries to come. The water pollutants causes serious damage to human body by food chain and other ways. Such as polluted ground water. Sometimes they may bring some sort of change in genetic due to the tannery wastes of "Hazaribagh Leather Processing Area" the nearby river water and ground water of the adjacent area contains abnormally excess amount of harmful chromium along with arsenic, rotten organic substances, dissolved and un-dissolved salts, lime etc. The detrimental substances deposited in the bed of lakes and adjacent low lying areas is gradually decreasing the ratio of Oxygen in water the life of fish and other living organism is endangered. There by the total ecosystem is abrupt. Water of different lakes from different parts of Dhaka city were also found vulnerable.

Pollutions in Lakes of Dhaka City

Natural Pollutants

Not all pollution is caused directly by man's activities. Natural water pollution may be considered as changes in the constituents and properties of water in the absence of man's activities, which are significantly greater than the normally expected variations. There is no distinct division between the normal quality extremes and natural pollution. Each specific situation must be judged on the basis of the various factors involved.It was observed that in all these lakes human activities were main factor behind the deterioration of water. Throwing fecal wastes dumping of wastes garbage and running down drainage lines into the lakes are the main causes of deterioration of water.

Municipal Wastes

Man's normal domestic and municipal activities result in the creation of wastes which may be broadly termed sewage. Municipal sewage includes, in addition to normal domestic sewage, wastes from commercial and industrial establishments, hospitals, hotels, institutions and in some cases, surface drainage from paved areas. The constituents added to the water during its use will include oils and grease, grit, paper, ground garbage, synthetic detergents, dissolved and suspended organic and inorganic matter, bacteria and various other substances depending on the commercial and industrial complex which discharges to the sewers. In Gulshan lake sewage lines from diplomatic zone at Dhanmondi wastes from residential area and at Banani commercial wastes are the key factor polluting the water as municipal wastes.

Industrial Wastes

The types of wastes produced by industries are extremely complex and variable. They contain organic matter, acid or alkaline substances, chemicals, suspended matter, poisonous substances, radioactive materials, heat, color, tastes and odors, oils and a wide variety of other substances. The amounts of these materials which are discharged to streams and underground waters are also highly variable. In some industries, adequate treatment methods have been developed and used to render the wastes relatively harmless. Industrial effluents from Tejgaon industrial area, effluents from Hazaribagh tannery areas and dyeing effluents from Banani are the factors polluting lake water respective areas.

Agricultural Wastes

The development of agricultural lands and the increasing use of water for irrigation usually result in significant changes in water quality. Increased suspended solids during periods of high surface run off are commonly associated with agricultural development where soil cover has been removed and adequate soil conservation measure is not employed. The increase concentra-

tion of dissolved minerals in the return flow from irrigated areas has long been recognized. In arid regions the high rates of evapo-transpiration result in large consumptive losses of water, and therefore in increase concentrations of the dissolved constituents in the surface supplies.

In Gulshan lake basin area, the return flows from irrigated lands contain increase amounts of hardness. Base-exchange reaction may decrease high sodium concentrations but intensify the concentrations of calcium and magnesium. Increased attention has recently been given to the effect of insecticides, pesticides, and herbicides, which are applied to croplands. Streams draining area treated with such materials frequently contain significant concentrations of the chemicals reaching rivers and lakes. This problem is receiving much attention since the toxic effects of the materials used are highly detrimental to many uses of water.

Encroachments

Environmental degradation has found due to unauthorized encroachments of the lake land and converted to the built-up areas. With such encroachments of the lakes going apace and waste water, garbage and pilling materials finding way into the lake from different part. These lakes that still remain escaping human settlement and greed of the land grabbers are being polluted at will.

Conclusion

Water is essential for life. In the earth, water is available as surface water and ground water. Through experiment it is found that ground water is fresh in comparison with surface water. The virtues of ground water are the favorable biological and physical qualities. The slow percolation and horizontal movement of water only a few feet a day through the ground is a super filtration process removing all pathogens and helping to modify color, turbidity and with a few expecting taste and odor. Polluted water has drastic affect on human health. As well as it also affect fish culture, deteriorate the soil constituents, humus and also pollutes ground and surface water. As a whole it changes the equilibrium of the ecosystem. In the present years the rapid deterioration of the global environment specially water pollution has become a crucial issue that has drawn a significant attention of the world community. Of the total water in the world, just 97.3% is safe and only 2.7% is fresh water. But this small amount of fresh water is threatened by many cases. If we do not take any necessary steps at this moment, the next generation will have to face crucial fresh water problems in the future. So we will enable to identify main pollution factors and also give the guidelines how to prevent the pollution and keep the environment safe in Dhaka city.

Bibliography

APHA (American Public Health Organization), 1975. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, (14th ed). New York.

BSTI ('Bangladesh Standards and Testing Institution), 1989.Bangladesh Standard Specification for Drinking Water, (BDS-1240).

K-U Reimann, 1993. Geology of Bangladesh, (Gebruder Borntraeger, Berlin, p.71.

WHO (World Health Organization).1991. Guidelines for Drinking Wafer Quality, (Vol.1, Recommendation, Geneva).

Chapman, D. 1996.[Ed.] Water Quality Assessments. A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring. 2nd edition. Chapman & Hall, London.

Chilton, J. Groundwater. In: D. Chapman,1996. [Ed.] Water Quality Assessments. A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring. 2nd edition. Chapman & Hall, London.

Foster, S.S.D. and Gomes, D.C.1989. Groundwater Quality Monitoring: An Appraisal of Practices and Costs. Pan American Centre for Sanitary Engineering and Environmental Science (CEPIS), Lima.

Meybeck, M. and Helmer, R. Introduction. In: D. Chapman,1996. [Ed.] Water Quality Assessments. A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring. 2nd edition. Chapman & Hall, London.

Nash, H. and McCall, J.G.H.1994. Groundwater Quality. Chapman & Hall, London.

WHO,1993.Guidelines for Drinking-water Quality. Volume 1 Recommendations. 2nd edition.World Health Organization, Geneva.

WHO (In prep.) Guidelines for Recreational Water Use and Beach Quality. World Health Organization, Geneva.

Cyclone Aila and it's Impacts on Bangladesh

Md. Shajahan Hossain*

Bangladesh is situated in South Asia. Three sides of it are contiguous with India and South side is with the Bay of Bengal. Only the smallest portion in the South-East is attached with Myanmar. Geographically this is also situated in the tropical region. The location has a severe impact on the country. The impact is mainly on the natural disaster. According to the study Bangladesh is located in one of the natural disaster prone areas of the world. Flood, drought, landslide, tidal shores and cyclone are some of the examples. Cyclone though is mentioned in the last but it is most severe that strikes on Bangladesh at a regular interval. The latest name of this cyclone that hit on Bangladesh in the last year was called the Cyclone Aila. Its impact is so vast and severe that people are to face the problem even after one year of its hit; e.g. health impact, Socio-economic impact and environmental impact. The present article will pay an especial attention to focus the general information about the cyclone Aila and its various impacts on the affected people in the affected areas.

Cyclone Aila:

Normally a cyclone is an atmospheric system characterized by the rapid inward circulation of air masses about a low-pressure center, usually accompanied by stormy, often destructive weather. The term "cyclone" refers to such storms' cyclonic nature, with counter clockwise rotation in the Northern Hemisphere and clockwise rotation in the Southern Hemisphere. Depending on its location and strength, a tropical cyclone is referred to by names such as hurricane, typhoon, tropical storm, cyclonic storm, tropical depression, and simply cyclone. High speed airflow and heavy rainfall are the common characteristics of cyclone.

The Cyclone Aila is a tropical cyclone[1]. Tropical cyclones feed on heat released when moist air rises, resulting in condensation of water vapor contained in the moist air. They are fueled by a different heat mechanism than other cyclonic windstorms such as nor'wester, European windstorms, and polar lows, leading to their classification as "warm core" storm systems. Tropical cyclones originate in the doldrums near the equator, about 10°North and South away from it.The term "tropical" refers to both the geographic origin of these systems, which form almost exclusively in tropical regions of the globe, and their formation occurs in maritime tropical air masses. The Cyclone that struck on the south of Bangladesh and India on 25 May, 2009 is known as the Cyclone Aila.

Naming of the Cyclones:

There is a frequently asked question how the names of Cyclones come up

* **Senior Lecturer, Department of General Education,Northern University Bangladesh**

[1] A tropical cyclone is a storm system characterized by a large low-pressure center and numerous thunderstorms that produce strong winds and heavy rain.

with these names that hit coasts across the globe and why most of them are named after women? Most of the people know that the cyclone that hit in the coast of Bangladesh and India was called the Cyclone Aila. It's meaning is 'fire' that is originated from the Maldives language **'dhivehi'.**

Actually, the names of the cyclones across the world are fixed in advance by WMO (World Meterological Organization), an intergovernmental body that collaborates on weather data and sets conventions on forecasting, shifts through lists of cyclone names. Bangladesh is a part of an eight member sub-division of WMO that includes India, Pakistan, Myanmar, Thailand, The Maldives, Oman and Srilanka. In 2004 these countries fixed a list of names that are used sequentially.

Table: Northen Indian Ocean Cyclone Names

List 1	List 2	List 3	List 4	List 5	List 6	List 7	List 8
Onil	Ogni	Nisha	Gir	Helen	Chapala	Ockhi	Fany
Agni	Akash	Bijli	Jal	Lehar	Megh	Sagar	Vayu
Hibaru	Gonu	Aila	Keila	Madi	Vaali	Baazu	Hikka
Pyarr	Yemyin	Phyan	Thane	Nanuak	Kyant	Daye	Kyarr
Bass	Sidr	Ward	Murjan	Hudhud	Nada	Luban	Maha
Eanoos	Nargis	Laila	Nilam	Nilofar	Vardah	Titli	Bulbul
Mala	Abe	Bandu	Mahasen	Priya	Sama	Das	Soba
Mukda	Khai Muk	Phet	Phailin	Komen	Mora	Phethai	

Names already used in the recent past have been shaded in the boxes above.

Impact of Cyclone Aila on Bangladesh:

Cyclone "Aila" hit the South-West border of Bangladesh on 25 May 2009 affecting millions of people in 11 coastal districts of the Bangladesh out of 64 districts. The impact was aggravated as the cyclone hit Bangladesh during the high tide cycle that resulted to tidal surges of up to 22 feet. The surge of water caused portions of the embankments to collapse and people who believed that the embankments could protect them did not have enough time to evacuate to higher and safer ground. During Cyclone Aila, the storm spent more time over-land than Cyclone SIDR in 2007, lingering over the coast of Bangladesh and increasing its impact on the vulnerable villages. A total 190 death toll has been recorded. In the aftermath of the Cyclone and tidal surges, some 100,000 livestock were killed and over 340,660 acres of cropland destroyed. The government of Bangladesh has also reported that over 6,000 kilometers of road were damaged or totally destroyed and around 1,400 km of flood protection embankments were washed away. Cyclone Aila made 375,000 people homeless, many of them have sought refuge on elevated roads and embankments while others were able to seek shelter in schools and other public buildings. Over 50% of displaced people (more than 200,000) are still living in the same condition even after one year of Cyclone Aila in severely affected Khulna and Satkhira District.

A. Agriculture and Livestock:

Cyclone Aila completely damaged 3,412 acres (46%) of standing crops out of 7,392 acres. At the time of Aila major standing crops were jute and dry season vegetables, Aus and Aman paddy seeding just only started. According to the findings of a survey conducted by Koira Upazila administration, Cyclone Aila has caused damage to crops and properties worth about Tk. 10,000 crore in the Upazila (source;TheDaily Star 12/10/09). Before Aila, people in these areas were used to cultivate vegetable and fruits around their homestead and on the bank of the gher but these were fully damaged. Rice production was very limited in the areas because most cultivable land for rice was being used for shrimp cultivation. Due to flooding and standing water of the areas by saline water, the soil fertility and moisture levels are decreasing. People estimate that it will take the next 03 to 04 years for the lands to regain its crop production capacity. The immediate result is a decrease in food production leading to increased food insecurity for the whole community. Other sources of nutrition include poultry and livestock. Prior to Aila, people used to have poultry and rear livestock at household level, but most 80% animals were lost during cyclone Aila. Any livestock or poultry that survived during Aila were sold immediately after Aila at a reduced price due to lack of fodder, limited space to live and the general hardship that people were facing. Rice is available in the market but people do not have money to purchase the daily required amount for their family.

B. Impact on Health:

The most important impact of the Cyclone Aila on human health are discussed below-

Disease:

Due to the cyclone Aila many diseases out break. Water borne disease is the most common. Due to the polluted water and the lack of pure drinking water people are to depend on the sources of water around them pure or impure to use. As a result the people in the affected areas had to face diarrhea, dysentery, scabies and many other water borne diseases. Heather Blackwell, head of Oxfam in Bangladesh, said: "The cyclone-affected areas of Bangladesh are now an ideal breeding ground for all kinds of diseases". In many areas all the sources of fresh water have been polluted by the seawater, forcing people to drink dirty water. This has already made thousands of people sick. Without urgent action many more will fall sick.

Malnutrition:

The most immediate impact which the Cyclone Aila has caused is the scarcity of food in the affected area. Cyclone comes suddenly and gives hardly any time to go to the cyclone center taking food and other livelihood. That is why people are to leave their shelter without the food that they prepared for the future. So after the cyclone they get a small amount of food and livelihood. They are to depend totally on the food they get as the relief and that is extremely insufficient in comparison to the actual need. So they have been

suffering from the malnutrition.

Unsafe Water:

Cyclone survivors in Bangladesh are now facing a severe risk of disease as the supply of safe drinking water is reaching crisis levels. Cyclone Aila hit the coast of Bangladesh affecting millions of people and leaving over 750,000 people homeless. The full picture of the devastation caused by the cyclone is only now emerging. Salt water has contaminated nearly all the fresh water sources in the Southwest part of Bangladesh. The sanitation systems have collapsed in all the cyclone-affected areas and in addition human, animal and fish corpses are polluting the countryside.

C. Environmental Impact:

Normally environment is the total condition surrounding a person at any point on the earth surface including the living and non-living elements. Living indicates different plants, animals and human beings. The non- living are the air, water. soil etc those are lifeless. The Sunderbans, a region which houses 265 of the endangered Royal Bengal Tigers, was inundated with 6.1 m (20 ft) of water. Dozens of the tigers are feared to have drowned in Aila's storm surge along with deers and crocodiles. As of 27 May 2009, one tiger was found alive; it was found in a waterlogged cowshed following the cyclone's landfall. Additionally the forest remains under an estimated 2.4 m (7.9 ft) of water. On 27 May, conservationists have begun a search for the tigers throughout the forest. The search teams supplied with fresh drinking water for the tigers as their natural water source was inundated with salt water from Aila's storm surge. It is also caused for losing many imporatant plants and other animals in the affected area of Bangladesh.

Due to the Cyclone Aila the environmemt pollution was occured. Because the branches of trees and the dead animals get mixed with the water. That was how the water pollution was made. Bad odor from the water pollution was spread and made the air polluted. The ecological imbalance is also seen due to the loss of flora and fauna in the different levels of ecosystem. So the normal condition of environment is deteriorated.

Recommendations:

As cyclone is one of the uncontrollable natural hazards of the world that's why we have a few things to do for the minimization of damages in the affected areas. The recovery actions can be divided into two ways. Such as-

a. Short term Actions:

The important short term actions minimizing the damages are given below- one: embankments should be prepared and established (if needed) immediately, second: shelter of the affected people should be reconstituted on the basis of the priority, Third; Adequate food and livelihood supply must be ensured, Fourth: safe drinking water supply and sanitation should be

ensured so that the personal hygiene is maintained properly, Fifth: medicines must be supplied for the patients affected by the Cyclone Aila, Sixth: Management system should be strengthened to manage cyclone and also must have to deal rehabilitation of the affected people to their origin living place, seventh: the education related to cyclone can be introduced in different levels of institutions in our country; e.g. in SSC and HSC level so that the people can get the basic knowledge of doing their actions during cyclone. Special education should be introduced for the general people through mass media about cyclone, Eighth: sufficient budget should be allocated and well trained manpower must be appointed to manage cyclone, Ninth: strict rules and regulations should be introduced about distributing relief equally and equitably (if it is needed) during the hazards.

Conclusion:

Cyclone Aila as well as other cyclones are such natural hazards that are uncontrollable and most often devastating. It is common natural calamity in Bangladesh but not happened in between certain gap. It has many long term and severe impacts beside its immediate impact. Intensive researches (By govt. and non government organization) are needed to find out the effective ways to manage such hazard. Though cyclone is natural and Uncontrollable hazard, the damages and the number of human death can be reduced through the proper management and the implementation of the recommendations mentioned above. So it is the right time for the decision makers to go ahead to take effective initiatives for the great welfare of the people of affected areas to run the wheel of development of the country.

References:

1. Cyclone Aila, available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Aila accessed on 02/02/2010
2. Environmental impact of Cyclone Aila, available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclone_Aila# Environmental_impact **accessed on** 02/02/2010.
3. Impending Health Crisis in Cyclone Aila, available at: http://www.alertnet.org/thenews/fromthefield/220803/6e8c754e88475f5c8769db9f5c93a6da.htm accessed on 15/02/2010.
4. Naming of Cyclone, Available at: http://newswhichmatter.blogspot.com/2009/05/after-aila-cyclone accessed on 20/02/2010.
5. Rashid,Harun er. *Geography of Bangladesh*, Dhaka, University Press limited; 1991.
6. Socioeconomic Impact of Cyclone Aila, available at http://www.ifrc.org/docs/appeals/09/MDRBD004ea.pdf accessed on 15/02/2010.
7. Tropical Cyclone, available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_cyclone accessed on 03/02/2010.

Urban Forestry and City dwellers: Ensuring quality of life and Environment

Khalid Md. Bahauddin*

Cities are growing rapidly. In 50 years, more than 80% of the world's population will live in an urban environment. Moving in search of a better life, people across the globe have abandoned traditional socio-economic systems, broken ecological bonds with nature, and flocked to urban centers. While this process started in the developed world, less developed countries have quickly caught up.

Sustainable urban development requires providing a healthy and sustainable living environment with basic services for all. A healthy and multifunctional urban green structure is one of the basic services to provide. Urban and pre-urban forestry (UPF), focusing on the tree-dominated part of urban and pre-urban green space, is a strategic, integrative, interdisciplinary, and participatory approach. Its goal is to sustainably develop the multiple benefits of forests and trees in urban environments.

Ongoing urbanization has brought about a wide range of challenges across the globe, and not only in terms of population growth. In the United States, for example, metropolitan areas tripled in size between 1950 and 1990. More land is needed for urban areas to provide inputs and outputs of resources and energy, with a detrimental effect on forests and other green areas.

During the early 1990s, more than a quarter of green spaces in Asia were expected to be lost within two decades due to continued urbanization and suburbanization. Continuing urbanization in the developing world has led to major problems in terms of hunger, poverty, inadequate shelter, social segregation, unemployment, pollution of water, soil, and atmosphere etc.

Experiences and research during recent years have shown that urban green structures are more than just "icing on the cake." The thought of urban forestry is new in Dhaka. As a developing country, city authorities are busy most of the time to give service facilities to the people rather than think about green resources. Most of the time different green institutions in the city and government deal with big urban greening programme by tree plantation activities. There are no exact areas wise statistics for the percentage of trees in the city and also no area wise planning for tree plantation. In 2002 Dhaka City corporation was able to plant only 29 thousand trees out of the targeted 45 thousand because of lack of empty space. In 2003, DCC has planned to plant six thousand trees to replace those that have been uprooted, and a further ten thousand in whatever empty space is available in Uttara and Mirpur area of Dhaka. But adequate open spaces

are needed for the sustainable development of a city. Let's discuss why we really need urban forestry in Dhaka city in term of environmental context. In Dhaka studies shown that suspended particulate matter (SPM) and ambient sulphur dioxide levels of air pollution are about 4 to 5 times higher than the levels prescribed in Bangladesh Air Quality Standard. An ADB report shown that 3,850 premature deaths could be avoided had there been a reduction of SPM concen-

* Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University and Environment Literature Editor, Environment Society

trations in Dhaka to the level of Bangladesh Air Quality Standard. Economic cost, because of such deaths and illnesses in Bangladesh, may reach US $800 Million a year. One of the most effective ways to control air pollution is creating more woodland around the city and increasing the number of trees in the parks and street in Dhaka. The SPM can be captured by the leaves of evergreen tree species. Several researches in US revealed that trees can remove pollution by intercepting airborne particles. In 1994, trees in New York City removed an estimated 1,821 metric tons of air pollutants at an estimated value to society of $ 9.5 million. Another study found that woodland in Nottingham was estimated to reduce concentrations of sulphur dioxide and nitrogen oxides in the air by 4-5%.

In Dhaka city carbon dioxide concentration is one of the major problems locally. Urban forestry can play a great role to reduce it. Research in USA revealed that 1 acre of new forest will sequester about 2.5 tons of carbon annually. Trees can absorb carbon dioxide at the rate of 6 kg/tree/year. Planting 100 million trees could reduce the amount of carbon by an estimated 18 million tons per year and at the same time, save consumers $4 billion each year on utility bills in America alone. In Dhaka city, heat island occurrence is common problem due to congested and high rise building structures. Trees reduce temperatures and mitigate the impacts of urban heat islands; average daytime summer air temperatures in a newly constructed and unshaded community can be some 3 to 5 degrees Fahrenheit higher than in an adjacent area with older, established trees. The same insulating effect, but in reverse, can be felt in winter. Study also estimates that air conditioning to cool cities from this (heat island) effect accounts for 5 to 10% of urban peak electric demand. These temperature effects are also linked to how forests retain moisture and block wind. By keeping the air trapped in forests, temperature variations are less dramatic. It's found that in Dhaka 33% inhabitants experience hearing problems from noise pollution. But increasing trees and other vegetation can play an important role in attenuating noise through and absorbing sound energy. In US one research estimate suggested that 7db noise reduction was achieved for every 33m of forest while other reported field tests show apparent loudness reduced by 50% by wide belts of trees and soft ground. In urban area, trees can save energy. Trees properly placed around buildings can reduce air conditioning needs by 30% and can save 20-50% in energy used for heating. Shade from trees could save up to $175 per year (per structure) in air conditioning costs.-USDA Forest Service According to Dhaka city structure plan 1995-2015 policy 10 &11 demands the augmenting of city open space and securing the future open space although there have no specific policy which can support sustainable livelihood. Well-planned and well managed green areas are essential for

environmental and high quaiity of life for Dhaka city dwellers. So it is very much important for RAJUK and Dhaka City Corporation to rethink about these issues and necessary actions need to be taken.

POLLUTION EFFECTS ON BIRDS

Md. Moinuddin Ahmed *

Pollution is all around us. It is in the air that we breathe, the water we drink and the food that we eat. But human are not the only one combating the problems of poor air quality and chemical laced food and water. The animals of our planet are in crisis, as well as the birds.

WATER POLLUTION

It is reported that municipal, agricultural and industrial waste account for the majority of water pollution throughout the world. Pesticides and heavy metals that are leaked into rivers, lakes and streams can cause illnesse and death in birds, threatening individual species. Water pollutants can also reduce the amount of oxygen in the water that eventually kills the fish. Birds that rely on fish as a source of food will often need to move to other areas to feed, causing an upset to the natural balance.

NOISE POLLUTION

Some people just want some peace and quiet, and apparently, so do the birds. The University of Colorado at Boulder has conducted a three-year study that proves noise pollution affects birds and their habits. The biggest problem that birds face when there is too much noise is their ability to communicate. Birds that vocalize at lower frequencies are easily drowned out by noise pollution, affecting their ability to attract a mate and socialize with the other birds in their community. But finches and other birds that vocalize at a higher frequency appear uninfluenced by the hustle and bustle of noise pollution—apparently ignoring the mass exodus of their fellow, winged friends.

A new study has come up with the strongest evidence yet that noise pollution negatively

influences the nesting habits of birds. The study also indicates that at least a few species opt for noisy areas over quiet ones, perhaps because of their vocalisation pitches, a reduction in nest predators and less competition from other song birds that prefer quiet environments. The researchers found that some bird species nested in quiet areas undisturbed by noise pollution, while other(less number) species were nesting in noisy areas.

LIGHT POLLUTION

Bright city lights look beautiful at night when viewed from a distance, but that is no consolation for the bird that can't find the way of home. Birds use the bright stars in the sky to determine the route for the next day, and when the city lights interfere with their view, birds can become confused and disoriented. Light pollution can affect the flight patterns of birds, rendering their usual migration paths impossible to follow. City birds are also finding it very difficult to sleep with all of the bright lights, and some birds have become uncharacteristically active at night.

The writer is currently serving in a private commerci al bank

Unfortunately, light pollution also causes some birds to succumb to deadly collisions with buildings and other objects in the sky that may be difficult to see when "blinded by the light".

OIL POLLUTION

Birds that are considered "water birds" are greatly affected by what is known as oil pollution. According to National Geographic, approximately 500,000 water birds are killed every year due to oil spills. Feathers ordinarily provide a waterproof protection for birds, but when the feathers are covered in oil, they lose this quality. This causes some of their skin to become exposed and at risk to the elements. Birds who attempt to clean their feathers will often ingest the oil and become ill or even die from poisoning.

AIR POLLUTION

Poor air quality due to smoke and noxious gases can have a devastating effect on the bird

population in dense areas. Not surprisingly, these pollutants have even drifted up into the polar regions, putting the lives of arctic birds at risk.Birds have very high respiratory rates, which make them even more susceptible to pollutants in the air and to airborn impurities. Air pollutants damage a wide variety of materials. Burning oil and coal produce sulfur oxides, which cause steel to erode two to four times faster than normal. When combined with other pollutants (soot, smoke, lead, asbestos, and so on), sulfur oxide particulates cause corrosion to occur at an even faster rate. By themselves, particulates damage and soil materials, structures, and equipment. Air pollutants speed the erosion of statues and buildings, which in some instances, destroys works of art.

BIBLIOGRAPHY

1. National Renewable Energy Laboratory (2006). Non-technical Barriers to Solar Energy Use: Review of Recent
2. Literature, Technical Report, NREL/TP-520-40116, September
3. REN21 (2008). Renewables 2007 Global Status Report, Paris: REN21 Secretariat
4. United Nations Environment Program (2006). Changing climates: The Role of Renewable Energy in a Carbonconstrained World, January
5. HM Treasury (2006). Stern Review on the Economics of Climate Change.
6. International Council for Science (c2006). Discussion Paper by the Scientific and Technological Community for the14th session of the United Nations Commission on Sustainable Development
7. International Energy Agency (2006). World Energy Outlook 2006: Summary and Conclusions, OECD
8. International Energy Agency (2007). Renewables in global energy supply: An IEA facts sheet, OECD

Healthy Environment Healthy Bangladesh

Dr. A S M Atiqur Rahman*

Environment has become the global and national issue in the current century. In some way or form, almost all countries have recognized the importance of environment, nature and its biological diversity, ecology for their societies and have therefore understood the need to maintain it. Yet, power, greed and politics have affected the precarious balance.

Environment has become a growing concern from developing countries and various NGOs are the need for public participation and the effect on populations and least developed countries that global warming negotiations have. The impacts of climate change will be felt on the world's poorest countries the most. In some cases, climate changes have already affected some small island nations. Climate justice, equity and sustainable development are all important parts of this debate that are often left out of mainstream discourse. Equal rights to the atmosphere for all human beings and equity within and between nations are paramount.

It is agreed that it is today's rich nations who are the responsible for global warming as greenhouse gases tend to remain in the atmosphere for many decades, and rich courtiers have been industrializing and emitting climate changing pollution for many more centuries than the poor countries.

Environment is the sum of the total of the elements factors and conditions in the surroundings what may have an impact on the development, action, or survival of an organism or group of organisms. The environment also involves the relationships of the human environment, such as the social, cultural and economic environment with the biophysical environment. In the present article, we are going to discus few of them.

1. Natural Environment:

The natural environment, commonly referred to simply as the environment, is a term that encompasses al living and non-living things occurring naturally on earth or some region thereof.

The concept of the natural environment can be distinguished by components:

- Complete ecological units that function as natural systems without massive human intervention, including all vegetation, animals, micro-organisms, soil, rocks, atmosphere and natural phenomena that occur within their boundaries.
- Universal natural resources and physical phenomena that lack clear-cut boundaries, such as air, water, and climate, as well as energy, radiation, electric charge, and magnetism, not originating from human activity.

* Professor, Institute of Social Welfare and Research
University of Dhaka

- The natural environment is contrasted with the built environment, which comprises the areas and components that are strongly influenced by humans. A geographical area is regarded as a natural environment, if the human impact on its kept under a certain limited level.
- Natural environment is changing. Especially in the last few decades the characteristics of the natural environment has been tremendously changed due to human activities. We have misused the natural resources and interrupted the ecological system massively. So people of the third world country like Bangladesh is facing the impact of the climate changed.

Concerns for Natural Environment:

● Green House Effect:

The greenhouse effect is the heating of the surface of a planet or moon due to the presence of an atmosphere containing gases that absorb and emit infrared radiation. Greenhouse gases, which include water vapor, carbon dioxide and methane, are almost transparent to solar radiation but strongly absorb and emit infrared radiation. Thus, greenhouse gases trap heat within the surface-troposphere system.

● Climate Change:

Climate change is any long-term change in the patterns of average weather of a specific region or the earth as a whole. Climate change reflects abnormal variations to the Earth's climate and subsequent effects on other parts of the Earth, such as in the ice caps over durations ranging from decades to millions of years. Climate change is already happening and represents one of the greatest environmental, social and economic threats facing the planet. The European Union is committed to working constructively for a global agreement to control climate change, and is leading the way bye taking ambitious action of its own.

Human activities that contribute to climate change include in particular the burning of fossil fuels, agriculture and land use changes like deforestation. These cause emissions of carbon dioxide the main gas responsible for climate change, as well as of other 'greenhouse gases. To bring climate change to a halt, global greenhouse gas emissions must be reduced significantly.

● Global Warming :

The global warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global mean sea level. The Earth's Average surface temperature has risen by 0.76° C since 1850. Most of the warming that has occurred over the last 50 years is very likely to have been caused by human activities.

● **Disaster and Disaster Management:**

Bangladesh is more frequently experiencing disaster caused by natural, human and social hazards. Such conditions have resulted to widespread human, material and environmental losses causing huge damages and miserable disruption of the society. But this situation has made Bangladesh one of the pioneers in Disaster Management in the world. It has been possible by this least developed country as there is a very close relationship between environment, local people and their social and biophysical surroundings. This strong capacity of the people enhances their coping mechanism and intends them to deal with disaster successfully.

2. Social Environment:

The **social environment**, knows as the milieu, is the identical or similar social positions and social roles as a whole that influence the individuals of a group. The social environment of an individual is the culture that he or she was educated and/or lives in, and the people and institutions within whom the person interacts. A given social environment is likely to create a feeling of solidarity amongst its members, who are more likely to keep together, trust and help one another. Members of the same social environment will often think similar styles and patterns even when their conclusions differ.

Human being is the most important factor of social environment because human being creates social environment by interacting with the other important components of the environment. So human behavior and attitude has both positive and negative impact on the society.

Concerns for Social Environment

● **Tradition of domestic use of Water:**

Domestic water use is the use of water for indoor and outdoor household purposes– all the things we do at home: drinking, preparing food, bathing, washing clothes and dishes, watering the yard and garden, and even washing the dog. It is estimated that 15% of worldwide water use is for household purposes. Basic household water requirements have been estimated at around 50 liters per person per day, excluding water for gardens.

● **Waste Management:**

About 27 million people of 5 million households from 229 city corporations and municipalities of Bangladesh are responsible for generation of more or less 13,000 M. T. of municipal solid wastes a day. Improper management of municipal solid waste keeps the environment, public health, and comfort of the residents and aesthetic beauty of a city or town at a state of vulnerability. Proper management of municipal solid waste has been an urge of the city dwellers for leading a decent and hygienic livelihood.

● **Use of Natural Resources:**

Fuel: Each year the fuel equivalent to 11567 0 00,000,000 kilograms of oil is used all around the world. Fuel includes gas, coal, oil, nuclear, wood and

other materials. Worldwide fuel consumption average 1853 kilogram of oil per person per year. People throughout the world are now aware of the reality that fossil fuel will not last for ever.

Deforestation is another main producer of carbon dioxide. The causes of deforestation are logging for lumber, pulpwood, and fuel wood. Also contributing to deforestation is clearing new land for farming and pastures used for animals such as cows. Forests and wooded areas are natural carbon sinks. This means that as trees absorb carbon dioxide, and release oxygen, carbon is being put into trees. As the abundance of trees declines. Less carbon dioxide can be recycled. As we burn them down, carbon is released into the air and the carbon bonds with oxygen to form carbon dioxide, adding to the greenhouse effect.

● **Over Population:**

The rapid growth of population is a major problem for Bangladesh with the burgeoning population fast outstripping the limited resources of the Country. In 1971, the population was an estimated 70 million and in 2009 the population is around 150 million, more than doubling in 38 years. Throughout the decades of the 70s and 80s, Bangladesh had a strong program of population control and consequently the annual population growth declined from 3.4% in 1975 to 2.2% in 1991 to an estimated 1.9% in 1996. However, the growth rate is on the rise again and according to the UN, the annual population growth rate for 2000-2005 was 2.02%, with the projected population for the year 2015 at over 181 million. This rapidly growing population has already overtaken the ability of the State to provide them with education, health-care, shelter, food and employment and so we will have more and more impoverished and poverty-ridden people desperately looking for a way out. Of course, since 1990s, Bangladesh's economic growth has been phenomenal. The country has made convincing progress with economics and human development following independence in 1971. But still Bangladesh often ranks near the bottom in cross-country comparisons relating to governance and the poverty rate is really high.

3. Political Environment:

We are not only the social bring basically human being are become political being. So politics and political government are essential components of our life and civilization. The critical concern Political environment has a very important impact on every thing. The political environment includes all laws, government agencies, and lobbying groups that influence or restrict individuals or organizations in the society. Since our independence, the political situation of our country has never been stable. We achieved independency and democracy but the stability of politically environment has never been possible due to some ill practices of our political parties. All political parties promise to improve the law and order situation in the country after assuming power. Law and order situation of a country is dependent not only on a strong police force but also on a general improvement in the economy and an

increase in civic responsibility. This is why it is an easy promise to make but one of the hardest to implement. People are not born criminals but turn to crime when there are no alternative employment sources or the discrepancy between the rich and the poor is too large to breach.

4. Health Environment:

Environmental health addresses all the physical, chemical, and biological factors external to a person, and all the related factors impacting behaviors. It encompasses the assessment and control of those environmental factors that can potentially affect health. It is targeted towards preventing disease and creating health-supportive environments. This definition excludes behavior not related to environment, as well as behavior related to the social and cultural environment, and genetics.

Suggestions:

- As climate change is a growing concern for the world it is need to make a common platform for raising voice so that rich countries take the responsibilities and compensate.
- The draft Disaster Management Act needs to be formularized within a short period of time.
- As human being is the main factor of the society they have the ultimate responsibilities to protect environment. Behavior change helps to modify the way a person acts. We have to change the way we act in our daily life.
- Good governance, transparency and accountability need to be ensured for the betterment of the society.
- Social services should not be charity based rather it should be the right based approach.
- Natural Resources are scarce. So we need to be very careful using these resources.

References:

1. Municipal Solid Waste Management: Bangladesh Perspective/K. M. Nurul Huda. Dhaka, Academic Press and Publishers Library, 2008, xvi, 364 p., tables, 19 black and white illus., ISBN 984-08-0229-1.
2. www.worldmappers.org/posters/worldmapper_map119_ver5
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Oligarchy
4. http://www.globalissues.org

Industrialization and Biodiversity Concern of Bangladesh

Md. Mohiuddin*

The International Day of Biodiversity (IDB) is on 22 May and the official theme of International Biodiversity Day in 2010 is "Biodiversity for Development". Moreover, the UN declared 2010 the International Year of Biodiversity.

Biodiversity can be define as the diversity of living things and ecosystems, is a heritage that belongs to all mankind. One definition holds that biodiversity is a measure of the relative diversity among organisms present in different ecosystems. "Diversity" in this definition includes diversity within a species and among species, and comparative diversity among ecosystems. Three levels of biodiversity as identified are –genetic diversity ,species diversity and ecosystem diversity. **Genetic diversity** plays a great role in survival and adaptability of a species. When the surrounding environment changes, slight genetic variations are necessary to produce changes in the organisms' anatomy to enable it to adapt and survive. A species that has a large degree of genetic diversity among its population will have more variations from which to choose the most fit. Species that have very little genetic variation are at a great risk. With very little genetic variation within the species, healthy reproduction becomes increasingly difficult, and offspring often deal with similar problems to those of inbreeding. **Species diversity** is an index that incorporates the number of species in an area and also their relative abundance and **Ecosystem diversity** refers to the diversity of a place at the level of ecosystems. It can also refer to the variety of ecosystems present in a biosphere.

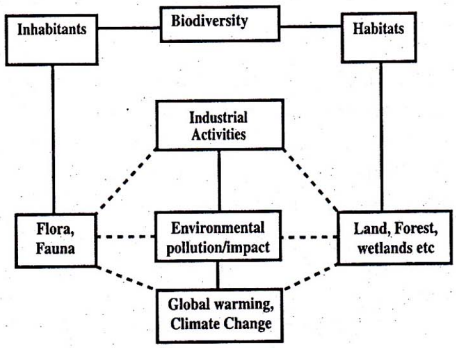
The main threats to biodiversity are the shrinkage of natural ecosystems under pressure from development –especially intensive agriculture and urbanization, overuse of natural resources like fish and trees, non-native invasive species, pollution of water, soil and air, which harms natural environments and climate change which determines the distribution of species and habitats. The global community made a commitment in Johannesburg to significantly reduce the rate of biodiversity loss by 2010, as well as to track progress towards achieving this target. The theme of World Environment Day 2010 "Many species. One Planet. One future." also emphasizes biodiversity concern.

Come to the theme of this year 'Biodiversity for Development' which indicates activities of development should be there but preserving the biological diversity. Development should not be treated as the enemy of biodiversity and concern of biodiversity should not halt the development activities. Rather together go approach of development and biodiversity is called as sustainable development.Bangladesh is not an industrial country. If no miracle

* Serving for a multinational company as Environment Engineer

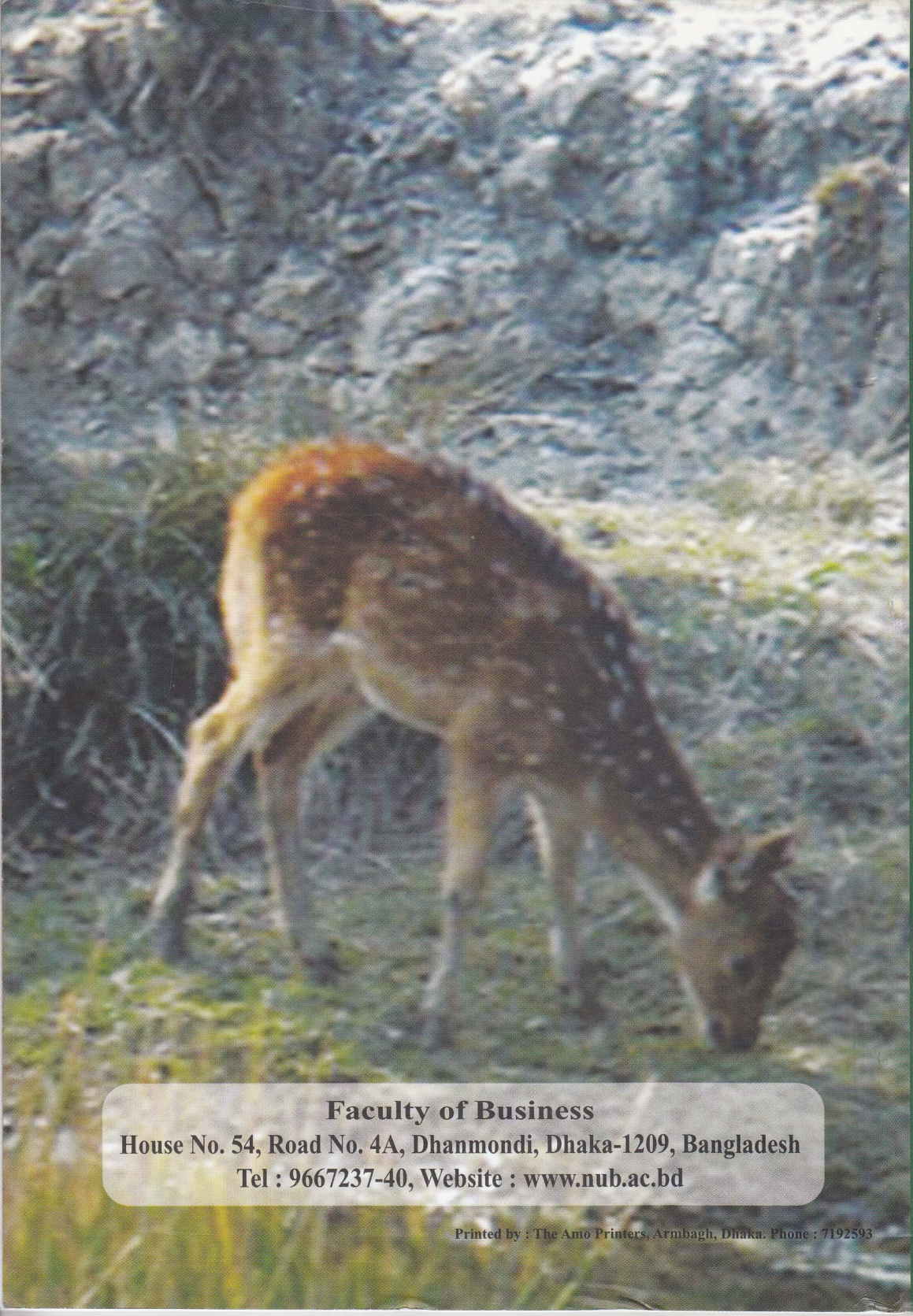
happens, it is far away for our country to obtain the status of an industrially saturated country. We have a lot to do to scale up our country in industrial sectors, and so to see industrial development of Bangladesh!

Relationship of Biodiversity to various aspects of industrialization is shown in the following figure:



From the simple chart, we notice Biodiversity has two wings –inhabitants (flora, fauna) and habitats (land, forest, water bodies etc.). Industrial activities can affect the elements of both the components of biodiversity either direct or indirect ways. From the inception to operation, all along the project life of an industrial entity, any decision has to be adopted keeping in mind that minimal impact will be experienced by inhabitants as well as habitats. For this reasons, experts are suggested that before starting any project related to industry; a feasible test must be conducted. Environment also provides a checklists (not exhaustive) for Environmental Impact Assessment (EIA) to ensure for caring biodiversity matters-

1. The site has been subject to an Environmental Impact Assessment which included fauna and flora detailed identification
2. There has been a fauna and flora survey covering the site after EIA
3. Have threatened or vulnerable species or rare species been identified in the area? (esp. on a red list or a protection list)
4. Is the site adjacent to/or close to or having a potential impact on an area officially designated of ecological interest?
5. Sites designated according to a national regulation (this would include wetland area, National parks etc)
6. Sites designated according to an international regulation or agreement (RAMSAR convention, World Heritage Sites, etc)
7. Does the project site require especial restoration/ rehabilitation program for the biodiversity?
8. Are there likely opportunities for the site to serve as ecological research area or promote environmental education efforts ?



Faculty of Business
House No. 54, Road No. 4A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh
Tel : 9667237-40, Website : www.nub.ac.bd

Printed by : The Amo Printers, Armbagh, Dhaka. Phone : 7192593